স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৬ষ্ঠ বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ জুন-জুলাই ২০১৭

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ ❑ প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মন ভালো করতে হলে
শারীরিক অসুখের মতো মনেরও অসুখ হয়। আর মনের অসুখ হলেই আমরা তাকে পাগল তকমা সেঁটে দিই। কিন্তু সেই অসুখ সারানোর জন্য আছেন মনশ্চিকিৎসক। কীভাবে? জানাচ্ছেন **ডা. সুমিত দাশ।**
৪

সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে গঠিত উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দলের প্রধানের বক্তব্য
জাতীয় আয় বা জিডিপি বাড়লেই সামগ্রিক সমৃদ্ধি হবে, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ভালো হবে, এমন সরল ধারণার পক্ষে তথ্য নেই। মাথাপিছু জাতীয় আয় কিছুটা বাড়া দরকার, কিন্তু নানা দেশের মাথাপিছু জিডিপি এক হওয়া সত্ত্বেও যেসব দেশের অর্থনৈতিক সাম্য বেশি, সেই দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সূচকের মান ভালো। সমাজে বৈষম্যে কেবল দরিদ্রদের স্বাস্থ্য খারাপ হয় তাই নয়, সেখানকার ধনীদের স্বাস্থ্যও তুলনায় খারাপই হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবা এই অসাম্য থেকে বেরিয়া আসার একটা রাস্তা—লিখেছেন **ডা. কে শ্রীনাথ রেড্ডি।**
৭

সর্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবার দাবির সঙ্গে আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও আমাদের সোচ্চার হতে হবে
মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন জন্মের পরের এক-দুবছরেই যা বাড়ার বাড়ে। মস্তিষ্কের আয়তন পুরো বাড়লে তবেই বুদ্ধির বিকাশ সম্পূর্ণ হতে পারে। এর জন্য শুধু শারীরিক পুষ্টিই যথেষ্ট নয়, মানসিক সঙ্গ, গল্প বলা, সবই দরকার। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত না হলে অনেক শিশুর বুদ্ধির পুরো বিকাশ হবে না, অনেকে গতরখাটা কাজের জন্যই কেবল উপযুক্ত হবে। এই বৈষম্যের অবসান চেয়েছেন **ডা. অরুণ সিং।**
১৫

অজানা জ্বর
খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ি, 'অজানা জ্বরে মৃত্যু'। কাকে বলে অজানা জ্বর, কীভাবে অজানা জ্বরকে জানা যায় আর জয় করা যায়? আপনার এ ব্যাপারে করণীয় কী? লিখছেন **ডা. অর্ক বৈরাগ্য।**
২০

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
মন ভালো করতে হলে	ডা. সুমিত দাশ	৪
সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে গঠিত উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দলের প্রধানের বক্তব্য	ডা. কে শ্রীনাথ রেডি	৭
সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবির সঙ্গে আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও আমাদের সোচ্চার হতে হবে	ডা. অরুণ সিং	১৫
অজানা জ্বর	ডা. অর্ক বৈরাগ্য	২০
কাশির সঙ্গে রক্ত	সম্পাদকমণ্ডলী	২৩
মাথা ব্যথার সাতকাহন	ডা. অনিন্দিতা	২৮
বার্ধক্যে চামড়ার ছত্রাক সংক্রমণ	ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই	৩০
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন		৩৩
গর্ভবতী মায়ের কী কী খাওয়া উচিত	জুনি ঘোষ	৩৪
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৩৭
গণেশের মুণ্ডু, কাটা পা অথবা প্লাস্টিকের গল্প	ডা. সৌম্যকান্তি বাগ	৪১
অতৃপ্তি ঘুমের অথবা মামুলি দ্বিপ্রাহরিক তন্দ্রার রোগ	ডা. গৌতম মিস্ত্রী	৪৪
আর্টিকেরিয়া বা আমবাত	ডা. জয়ন্ত দাস	৪৯
সীমান্ত জীবন: পর্ব ৩	ডা. মৃন্ময়	৫২
হরেকরকম		
ডেন্টাল ফিলিং দিয়ে দন্তক্ষয় আটকায়? পুরোনো ডেন্টাল ফিলিং-এ ক্ষতি কতটা?		৫৩
বস্তি জীবনে জনস্বাস্থ্য সমস্যা	ধ্রুবজ্যোতি দে	৫৪

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল
পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র
অমর কোলে স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে
শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র গ্রাহক হোন।
সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315
সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

মানুষের রোগ, মানসিক রোগ

সাইকোথেরাপি আর কাউন্সেলিং। বাংলায় বলি মনশ্চিকিৎসা আর মনোমন্ত্রণা, যদিও দ্বিতীয় শব্দটা এখনও প্রচলিত নয়। মনশ্চিকিৎসার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থেরাপিস্ট চাই, কাউন্সেলিং বা মন্ত্রণার তেমন ধরাবাঁধা ছক নেই। এখনও মনের কষ্টকে দেহের কষ্টের মতো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মানুষও চট করে বলতে চান না তাঁর মানসিক সমস্যার কথা। অনেক সময় মানসিক কষ্ট হাজির হয় শারীরিক সমস্যা রূপে; সেখানে মানসিক সমস্যা বলে তাকে চিহ্নিত করলে রোগী নিজেও তা মেনে নেন না। একবার এইসব প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে উঠতে পারলে সাইকোথেরাপি খুব কাজ দিতে পারে।

সাইকোথেরাপি রোগীকে ভরসা দেয়। থেরাপিস্টের উপস্থিতিই রোগীকে অনেকটা আশ্বস্ত করে। নানা ভুল ধারণার জন্য যে উদ্বেগ তৈরি হয়, থেরাপিস্টের কথায় অনেক সময় তা কেটে যায়। এছাড়া থেরাপিস্টের কর্তৃত্বপূর্ণ পরামর্শ বা সাজেশন নানা উপসর্গ ও নেশা ছাড়াতে কাজে লাগে, আবার নিজেকে সাজেশন দিয়ে রোগী ভালো হয়ে উঠতে পারেন। কখনো আবার থেরাপিস্ট বন্ধুর মতো যুক্তি দিয়ে রোগীকে তাঁর চিন্তা ও আচরণের ভুল ধরিয়ে দেন। আছে ইমোশনাল ক্যাথারসিস বা আবেগ নির্গমন করে রোগীকে স্বাভাবিক চিন্তার পথে আনা, এমনকী আছে পুরস্কার-তিরস্কার নীতির ওপর তৈরি 'শাসন'পদ্ধতিও।

এসব করার জন্য যথাযথ পরিবেশ অনেক সময় সৃষ্টি করে নিতে হয়। হাফওয়ে হাউস, রাতের হাসপাতাল, দিনের হাসপাতাল, থেরাপিউটিক কমিউনিটি। আবার সেরে ওঠা মানসিক রোগী সব সময় সমাজে সাদরে গৃহীত হন না, তাঁর অসুবিধা দূর করার জন্য চাই যথাযথ পুনর্বাসন।

আমাদের দেশ মানসিক রোগের ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। পিছিয়ে থাকা শুধু রোগচিকিৎসায় নয়, বা তার জন্য প্রয়োজনীয় হাসপাতাল ইত্যাদি কাঠামো তৈরিতেই নয়, এ দেশ পিছিয়ে আছে মানসিকতায়। হাসপাতালে থাকা মানসিক রোগী ভালো হয়ে গেলেও অনেক সময় বাড়ি ফিরতে পারেন না, বাড়ির মানুষ তাকে নেয় না। কখনো বা বাড়ি গিয়েও ফিরে আসেন হাসপাতালে। তিনি যে সুস্থ সেটাই হয় মুশকিল, ঘর তাঁকে ঠাঁই দেয় না, হাসপাতাল তাঁকে নিয়ে পড়ে বিড়ম্বনায়।

অথচ বিশ্বের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রোগের তালিকায় মানসিক রোগ ক্যানসার আর হার্টের অসুখের পাশেই আছে। এতে কর্মক্ষম দেহ সত্ত্বেও অজস্র দিন কাটে কর্মহীন নিরানন্দে, সমাজ বঞ্চিত হয় মনোরোগীর স্বাভাবিক কাজ থেকে, আর তিনি বঞ্চিত হন মনুষ্যজীবন থেকেই।

মানসিক রোগীদের পাগল তকমা লাগানোর নিষ্ঠুরতা কাটুক। মানুষের মনের কষ্টকে বোঝার মানুষ বাড়ুক।

দিন বদলাক।

মন ভালো করতে হলে

মনের অসুখ হলে মানুষের হাবভাব, চালচলন বদলে যায়। তাতে তাঁর পরিপার্শ্বের যত বিড়ম্বনা, তাঁর নিজের বিড়ম্বনাও কিছু কম নয়। তখন তাঁর মন ভালো করতে পাশে এসে দাঁড়ান মনের ডাক্তার বা মনশ্চিকিৎসক। কীভাবে সাইকোথেরাপি বা মনশ্চিকিৎসায় রোগীর মন ভালো করে তাঁকে সুস্থ করে তোলা যায় তা নিয়ে একটা প্রাথমিক আলোচনা করেছেন **ডা. সুমিত দাশ।**

আমরা সাইকোথেরাপি (মনশ্চিকিৎসা) এবং কাউন্সেলিং (মনোমন্ত্রণা) কথা দুটো খুব ব্যবহার করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথা দুটো প্রায় সমান অর্থে ব্যবহার করা হয়। যদিও দুটোর মধ্যে একটা ফারাক আছে।

কোনো মানুষ যখন মানসিক চাপে পড়েন তিনি তার নিকটস্থ কোনো মানুষের শরণাপন্ন হন কথা বলার জন্য। তিনি তাঁর বন্ধু, শিক্ষক, আত্মীয় হতে পারেন। হতে পারেন কোনো ধর্মগুরু। এঁদের কাছে গিয়ে মানুষটি তাঁর সমস্যার কথা বলেন। আর তিনিও তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নানা পরামর্শ দেন যেটা অনেকক্ষেত্রে তাঁদেরকে চাপমুক্ত হতে সাহায্য করে। এই ধরনের অভিজ্ঞতা নির্ভর পরামর্শকে বলা হয় কাউন্সেলিং।

অপরদিকে যখন মনোগতিবিদ্যার কোনো তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মানুষটিকে উপসর্গ মুক্ত করতে, চিন্তা ও আচরণ পরিবর্তন করতে যে পরামর্শ দেন, তাকে বলা হয় সাইকোথেরাপি বা মনশ্চিকিৎসা।

সাইকোথেরাপির লক্ষ্য

যেকোনো সাইকোথেরাপি বা মনশ্চিকিৎসার কয়েকটা লক্ষ্য থাকে। বর্তমান উপসর্গগুলো দূর করা, যদি দূর করা না যায় অন্তত উপসর্গগুলোর গতি রোধ করা। তাঁর আচরণ এমনভাবে পরিবর্তন করা যাতে তিনি কর্মক্ষেত্রে বা ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সঙ্গে ঠিকভাবে মিশতে পারেন। সঠিকভাবে তার ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক দিকগুলি এমনভাবে বিকশিত করা যাতে তিনি একটা সুস্থ এবং কার্যকরী জীবনযাপন করতে পারেন।

এই প্রাথমিক বিষয়গুলো জেনে নিয়ে আমরা মূল আলোচনায় যাব। সাইকোথেরাপি অনেক রকমের হয়। এখানে মূলত সব থেকে পুরোনো পদ্ধতিগুলির আলোচনা করা হল।

১. সাইকো-অ্যানালিসিস (মনোবিশ্লেষণ)

আমরা পুরোনো সাদা-কালো সিনেমায় অনেকবার দেখেছি আলোছায়াময় এক ঘরে একটা কৌচে একজন মানুষ আধশোয়া হয়ে আছেন। তিনি নানারকম কথা বলছেন এবং মনশ্চিকিৎসক তাঁর কথা শুনে নানা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। এই সেই মনশ্চিকিৎসা যার সঙ্গে নানা রহস্যময়তা এবং ফ্রয়েডের নাম জড়িয়ে আছে—একে বলা হয় সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনোবিশ্লেষণ।

যদিও সাইকো-অ্যানালিসিস এই মুহূর্তে খুব চালু মনশ্চিকিৎসা-পদ্ধতি নয় তবুও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছ। ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্ব প্রয়োগ করেন ১৩০ বছর আগে। তার আগে মনকে ধরাছোঁয়ার বাইরের একটা বিষয় ভাবা হত। আর মনোরোগীকে শয়তানে পাওয়া মানুষ ভাবা হত এবং তার উপরে অত্যাচার করা এমনকী হত্যা করাও সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল। ফ্রয়েড প্রথম সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর তত্ত্ব নির্মাণ করেন (সে যত বিতর্কিতই হোক) এবং মানসিক রোগ সারাতে তার প্রয়োগ শুরু করেন। তাঁর এই কাজ মন এবং মনশ্চিকিৎসার এক বাস্তব ভিত্তি তৈরি করে। এটা সংক্ষেপে বলা হল।

ফ্রয়েড মনের এক মানচিত্র তৈরি করেন। কনশাস, প্রি-কনশাস এবং আনকনশাস এই তিনটি ভাগ! কনশাস বলতে সেই অংশটা বোঝায় যেখানে বাইরের জগতের এবং নিজের দেহের অনুভূতি ও উদ্দীপনা সবসময় সজ্ঞানে বোঝা যায়। প্রি-কনশাস বলতে বোঝায় মনের সেই অংশ যেখানে গভীর মনোযোগ দিলে তা চেতনাতে আসে। আর আনকনশাস বলতে বোঝায় যেটা সবটাই অবচেতন মনে আছে। এর মধ্যের অনুভূতিগুলিকে চেতনায় আসতে দেয় না এক মনপ্রহরী বা সেন্সর। অবচেতন মন কাজ করে প্রবৃত্তির তাড়নায় (instinctual drive) প্রবৃত্তির তাড়নার প্রধান হচ্ছে ইন্সটিংক্ট বা যৌন তাড়না। এই

যৌন তাড়নাকে লিবিডো (LIBIDO) বলে। লিবিডো বলতে বোঝায় সেই শক্তি যেটা দিয়ে যৌনতা মনে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন যৌনতা প্রথম থেকেই প্রাপ্তবয়স্কদের মতো লিঙ্গ বা যোনিতে সঞ্চারিত হয় না। এবং যৌনতার লক্ষ্য প্রাপ্তবয়স্কদের মতো যৌন কর্ম থাকে না। শিশু বয়স ঠেকে বিভিন্ন স্টেজ বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত যৌনতার লক্ষ্য এবং মাধ্যম আলাদা হয়। এই স্টেজগুলি পরপর হচ্ছে ওরাল স্টেজ (১২-১৮ মাস বয়স), অ্যানাল স্টেজ (৪৮-৩৬ মাস বয়স), ফ্যালিক স্টেজ (৩-৫ বছর বয়স), লেটেন্সি স্টেজ (৬-১৩ বছর বয়স) এবং শেষ পর্যন্ত জেনিট্যাল স্টেজ বা প্রাপ্তবয়স্ক যৌনতার স্টেজ। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ওরাল স্টেজে যৌনতার মাধ্যম হচ্ছে ঠোঁট, জিভ এবং শিশু যৌন আনন্দের লক্ষ্য হয় দুধ খাওয়া, চিবানো ইত্যাদি অর্থাৎ যেখানে ঠোঁট ও জিভের আন্দোলন হচ্ছে। একটা স্টেজে গমন যদি মসৃণ হয় তো সেই মানুষটি সুস্থ হয়, না হলে তার মধ্যে মানসিক রোগ সৃষ্টি হয়।

আর একটি প্রবৃত্তি হচ্ছে বা Aggression এটা মূলত পেশিশক্তি। ফ্রয়েড যৌনতাকে বা লিবিডোকে আরও ব্যাপকার্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি একে সৃষ্টিমূলক বলেছেন অপরদিকে আগ্রাসনমূলক। আগ্রাসন মূলত ধ্বংসমূলক।

মনের মানচিত্র অর্থাৎ টপোগ্র্যাফিক্যাল থিয়োরি অফ মাইন্ড (Topographical Theory of Mind) দিয়ে শুরু করলেও পরে ফ্রয়েড মনের একটা কাঠামো তত্ত্ব বা স্ট্রাকচারাল থিয়োরি অফ মাইন্ড (Structural Theory of Mind) তৈরি করেন। এর তিনটি অংশ ইদ (Id), ইগো (Ego) এবং সুপার ইগো (Superego)। ইদকে বলা হয় প্রবৃত্তি তাড়নার আধার। এ কাজ করে প্লেজার প্রিন্সিপালে (Pleasure principal) অর্থাৎ বাস্তবতা ভুলে যেটা করলে মনে আনন্দ হবে সেটা করতে চায়। এই ইদ-এর বেশিরভাগটাই আনকনশাস বা অবচেতনে থাকে। ইগো (Ego) দাঁড়িয়ে আছে বাস্তবতার উপর। যুক্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনা বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া মনের এই অংশের কাজ। এটা ছড়িয়ে আছে কনশাস, প্রি-কনসাস এবং সাবকনশাস মনের মধ্যে। এবং শেষ অংশ হচ্ছে সুপার ইগো (Superego)। একে বলা হয় বিবেক। অর্থাৎ নৈতিকতা, আদর্শ, সাময়িক আচরণ এই অংশ নির্ধারণ করে। এতা কনসাস এবং আনকনশাস মনে ছড়িয়ে থাকে। ইগোর কাজ হচ্ছে ইদ এবং সুপার ইগোকে ভারসাম্যে রেখে মানুষটিকে বাস্তবানুযায়ী কাজ করানো।

এরকম একটা জটিল মনের উপর বাইরের এবং দেহের মধ্যের নানারকম উদ্দীপনার প্রভাবে সৃষ্টি হয় নানা দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করার জন্য আছে এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ডিফেন্স মেকানিজম। এটা অবচেতনে কাজ করে। সুরক্ষা ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করলে মানুষ সুস্থ থাকে, না হলে মানসিক রোগ হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগীকে বলা হয় তার মনে যা আসছে সব কথা থেরাপিস্টকে বলে যেতে। ভালো মন্দ, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সবকিছু। এই বিষয়টাকে বলা হয় ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন (Free association)। বিষয়টি সহজ নয়। রোগী প্রথমে বলতে চান না। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগী আরও সহজ হয়ে যান। সব কথা বলতে শুরু করেন। আর আছে স্বপ্নের বিশ্লেষণ। সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। থেরাপিস্ট এসব শুনে সমস্যার মূলে যান। এবং রোগীকে প্রকৃত সমস্যা ধরিয়ে দিয়ে তাঁর রোগের উপসর্গ নিরাময়ে সাহায্য করেন।

২. সাপোর্টিভ থেরাপি (Supportive Therapy)

এই থেরাপির মূল তাত্ত্বিক ভিত্তিটা সাইকো-অ্যানালিসিস থেকে নেওয়া হলেও রোগীর বর্তমান সমস্যার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। মনের গভীরে গিয়ে দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করা হয় না। কোনো ঘটনা যখন রোগীকে দিশেহারা করে ফেলে তখন এই পদ্ধতিতে তার আবেগের ভারসাম্যকে ফিরিয়ে এনে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর অনেকগুলি পদ্ধতি আছে।

ক. গাইডেন্স (Guidance) বা চালনা: এই পদ্ধতিতে নানারকম উপদেশ দেওয়া হয়। ওইগুলো শিক্ষামূলক, খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত, কর্মক্ষেত্রে কাজের পদ্ধতি বা কীভাবে অবসর সময় কাটানো যায়, সেই সংক্রান্ত হতে পারে। গাইডেন্স-এ কেবলমাত্র বর্তমান সমস্যার মোকাবিলা নয় ভবিষ্যতে এই ধরনের সমস্যা কী করে মোকাবিলা করা যায়, সেটাও শেখানো হয়। তবে অতি নির্ভরশীল ব্যক্তিরা সব বিষয়ে গাইডেন্স চায়। এটা তার আত্মবিশ্বাসের পক্ষে ক্ষতিকর। সেটা থেরাপিস্টকে খেয়াল করতে হবে।

খ. সাজেশন (Suggestion) বা পরামর্শ: এটা হচ্ছে সবথেকে পুরোনো পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটা। ধর্মগুরুরা মূলত এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এখানে সাজেশান যিনি দিচ্ছেন তাঁকে কর্তৃত্বপূর্ণ হতে হবে। এবং রোগীকে তার প্রতি অনুগত হবে। যে উপসর্গ ত্যাগ করতে রোগী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেটা নিরাময় করতে সাজেশান ভালো কাজ করে। যেমন নখ কামড়ানো, সিগারেট খাওয়া ইত্যাদি। এছাড়া অনিদ্রাতেও এই পদ্ধতি কাজ করে। কিছু ক্ষেত্রে রোগী নিজেই নিজেকে সাজেশান দেয়। একে বলা হয় অটোসাজেশান পদ্ধতি।

গ. পারসুয়েশান (Persuasion) বা প্রতীতি: থেরাপিস্ট যদি এমন রোগী পান, যিনি যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করতে পারেন সেখানে পারসুয়েশান পদ্ধতি কার্যকরী। এখানে থেরাপিস্ট বন্ধুর মতো কাজ করেন। রোগীকে তাঁর চিন্তা ও আচরণের ভুলটা যুক্তির মাধ্যমে ধরিয়ে দেন। তাঁর মনে সঠিকভাবে চিন্তাভাবনার বিশ্বাসটা উত্থাপন করা হয়। যেটা তাঁর সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করে।

ঘ. রিঅ্যাসুরেন্স (Reassurance) বা ভরসা দেওয়া: ক্লিনিকে এই পদ্ধতির ব্যবহার খুব বেশি হয়। রোগীর কাছে থেরাপিস্টের উপস্থিতিই রোগীকে অনেকটা আশ্বস্ত করে। সাধারণত যে সমস্ত রোগী কিছু ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাঁদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুব কাজে লাগে। রোগীর এই ধারণা তাঁর পারিবারিক বা সামাজিক সংস্কার থেকেও আসতে পারে। রোগীকে যুক্তিপূর্ণভাবে তাঁর চিন্তার গলদ ধরিয়ে দিলে তিনি ভালো থাকবেন।

ঙ. ইমোশনাল ক্যাথারসিস (Emotional Cathursis) বা আবেগ নির্গমন: এই পদ্ধতিতে রোগী তাঁর আবেগকে বাইরে আনতে পারেন। থেরাপিস্টকে এখানে বিচারকের ভূমিকা নিলে চলবে না। রোগীকে বলতে তাঁর চিন্তাভাবনা আবেগ যা তাঁর উদ্বেগের কারণ সব উজাড় করে দিতে বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এভাবে প্রকাশ করেই রোগী অনেক সুস্থ হয়ে যান। যে চিন্তাভাবনা তাঁর কাছে নিষিদ্ধ মনে হত, বারবার বলে সেই চিন্তা সংবেদনশীলতা হারিয়ে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। যে সমস্ত রোগী সহজে বলতে পারেন না তাঁদেরকে উদ্বেগনাশী ওষুধ খাইয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে।

চ. কোরসিভ থেরাপি (Coercive Therapy) বা শাসনমূলক পদ্ধতি: এই পদ্ধতি সেই সমস্ত রোগীর জন্য, যাদের মধ্যে চিকিৎসা করার প্রতি অনীহা আছে। কিছুটা জবরদস্তি করে তাঁদেরকে থেরাপি করতে হয়। এই ধরনের রোগী সহজে কিছু বলতে চান না। তাঁদেরকে পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু কাজ দেওয়া হয়। সেটা পারা-না-পারার উপর পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। তবে সঠিক প্রয়োগ না করতে পারলে রোগীর ক্ষেত্রে এটা চাপ হয়ে যেতে পারে। তাতে তিনি নিজেকে আরও গুটিয়ে নিতে পারেন বা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন।

৩. পরিবেশ রদবদলের সুপটু ব্যবহার (Environmental Manipulation)

কিছু কিছু রোগীর সমস্যা কমাতে তাঁর পরিবেশ পালটাতে পারলে ভালো হয়। যেটা তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। উপসর্গ দূর করতে সাহায্য করে। এর কতগুলো মডেল আছে।

কিছু কিছু রোগীর সমস্যা কমাতে তাঁর পরিবেশ পালটাতে পারলে ভালো হয়।

ক. হাফওয়ে হাউস (Halfway House): যেখানে বাড়ির পরিবেশ বা পরিবার রোগীর পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক নয় তখন এখানে রাখা হয়। এটা ঠিক হাসপাতাল নয়। একটা কর্মী দল থাকে। যারা রোগীকে নানারকম সাহায্য করেন। এছাড়া আলাদা করে কাউন্সেলার থাকেন। প্রয়োজনে ওষুধ খাওয়ানোর লোক থাকেন।

খ. রাতের হাসপাতাল (Night Hospital): রোগী সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। সেটা তাঁর অফিস হতে পারে বা অন্য পারিবারিক অথবা সামাজিক দায়দায়িত্ব হতে পারে। সেটা সেরে তিনি রাতে এই হাসপাতালে ফিরে আসেন। এখানে তাকে লক্ষ রাখা হয়।

গ. দিনের হাসপাতাল (Day Hospital): এক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটো। সারাদিন তাঁকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখা হয়। হাতের কাজ শেখানো, গান করা, খেলাধুলা শেখানো ইত্যাদি। রাতে বাড়ি ফিরে যান।

ঘ. থেরাপিউটিক কমিউনিটি (Therapeutic Community): পরিবেশ-বদলের সুপটু ব্যবহারের এক সর্বোচ্চ রূপ বলা যেতে পারে এই থেরাপিউটিক কমিউনিটিকে। এখানে সমস্ত হাসপাতাল কর্মীকে একটা চিকিৎসা-গোষ্ঠীর অংশ ভাবা হয়। হাসপাতাল চালানোর প্রত্যেকটি পদে একজন করে রোগী থাকেন। তাই ধরে নেওয়া হয় তাঁরা যে কাজই করবেন তাঁর সহকারীর সুরক্ষার জন্যে করবেন। এই কর্মী বাছাই করাকে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ বলা যায়। দীর্ঘদিন ধরে প্রবলভাবে এই কাজে অনুপ্রাণিত ও কাজের জন্য নিবেদিত মানুষকে কর্মী হিসাবে বাছাই করা হয়। সকল সদস্যের জীবনযাত্রা পালটে দেওয়াই এর লক্ষ্য। রোগীর সততা, দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে এবং অসামাজিক আচরণ দূর করে তাঁকে প্রায় এক নতুন মানুষ তৈরির চেষ্টা করা হয়। এবং থেরাপিউটিক কমিউনিটির কোনো সদস্য তখনই বাড়ি যেতে পারেন, যখন তাঁর দায়িত্ববোধ সন্তোষজনক হয় এবং নতুন কর্মদক্ষতা তৈরি হয়।

ঙ. পুনর্বাসন বা রিহ্যাবিলিটেশন (Rehabilitation): পুনর্বাসন বিষয়টি সার্জারি এবং অর্থোপেডিক বিভাগেও করা হয়। মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে মন-সমাজকর্মীর ভূমিকা খুব বেশি। অসুস্থতা রোগীর মনে এক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। সেটা দূর করতে হয়। এই সময় তাঁকে এমন কিছু কাজ দিয়ে সাহায্য করা উচিত যাতে তাঁর অর্থনৈতিক সুরাহা হয়। সঙ্গে কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তার মধ্যে এক অসহায়তা দেখা দেয় যেটা তাঁর সুস্থতার পথে বাধা হয়। এক্ষেত্রে শুধু রোগী নয় তার পুরো পরিবারের সঙ্গে বসে পরিকল্পনা করতে হয়।

বাইরের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা বা এক্সটার্নালাইজেশন অফ ইন্টারেস্টস (Externalization of Interests)

মানসিক উদ্বেগ, অবসাদ অনেক সময়ই মানুষকে গুটিয়ে অন্তর্মুখী করে তোলে। তিনি নিজেকে পরিবার, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। তখন তাঁকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে বহির্মুখী কিছু বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

এর মধ্যে মিউজিক থেরাপি প্রধান। অর্থাৎ গান শোনা বা গান গাওয়া। এছাড়া যাঁকে দিয়ে সম্ভব নাটক, নাচ, কবিতা-সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মানুষ এই সব কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর দ্বন্দ্ব-উদ্বেগকে বাইরে নিষ্ক্রমণ করে দেয়। এই ধরনের থেরাপি সামাজিকভাবে মেলামেশার দক্ষতা বাড়ায়। যেহেতু এ-ধরনের কর্মের জন্যে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে তাই গোষ্ঠী অনুভূতি তৈরি হয়। সব কিছু মিলে তার মানসিক রোগের উপসর্গ দূরীকরণের সাহায্য করে।

মনশ্চিকিৎসার এই পদ্ধতিগুলির বাইরেও আরও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেগুলো এখনকার মনশ্চিকিৎসাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, একটি ডি-অ্যাডিকশন সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করেন।

সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে গঠিত উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দলের প্রধানের বক্তব্য

ডা. কে শ্রীনাথ রেড্ডি ২০১৬ সালের ২৪ জানুয়ারি শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ডাকা 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিয়ে সভায় যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেটির লিখিত রূপ এখানে রাখা হল।

আমার কাছে কোনো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন নেই। তবে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই আমার পূর্ববর্তী বক্তারা আপনাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ে আমার ঠিক পূর্ববর্তী বক্তা ডা. অরুণ সিং তাঁর সাবলীল উপস্থাপনা যেখান থেকে শুরু করেছিলেন তারই সূত্র ধরে আমি এই বিষয়ের উপর কিছু আলোকপাত করব।

চিরায়ত অর্থনীতির ধারণা অনুযায়ী কোনো দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হলেই সেই দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের মান বৃদ্ধি পাবে। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশের কিছু অর্থনীতিবিদ, যাঁরা দেশের নীতি নির্ধারক, তাঁরা এখনও ওই ধরনের ভাবনাচিন্তায় বিশ্বাস করেন। চিরায়ত অর্থনীতির সূত্র প্রেস্টন কার্ভ (যা নাকি মাথাপিছু জিডিপি-র সাথে গড় আয়ু বৃদ্ধির সম্পর্ক নির্দেশ করে)অনুযায়ী কোনো দেশের মাথাপিছু জিডিপি-র মান কম হলে সেই দেশের মানুষদের গড় আয়ুও কম হবে এবং মাথাপিছু জিডিপি-র মান বেশি হলে সেই দেশের মানুষদের গড় আয়ুও একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। মাথাপিছু জিডিপি-র মান বৃদ্ধি পেয়ে যখন ৪০০০/৫০০০ এ পৌঁছোবে, তখন কিন্তু গড় আয়ুর প্রান্তিক বৃদ্ধি ঘটবে এবং গ্রাফে গড় আয়ুর তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি বন্ধ হবে। এর থেকে বোঝা যায় যে জিডিপি-র বৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত গড় আয়ুকে বাড়তে সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল উইলকিনসন, পিকেট এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের তত্ত্ব। ওঁরা দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু জিডিপি এক হওয়া সত্ত্বেও যেসব দেশের অর্থনৈতিক সাম্য বেশি, সেসব দেশের নাগরিকদের

কোনো সমাজে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগের সুফল তখনই প্রত্যাশিত মাত্রায় পাওয়া যাবে যদি সেই সমাজে সাম্যের মাত্রা ভালো পরিমাণে বিরাজ করে।

স্বাস্থ্যসূচক এবং অন্যান্য সামাজিক সূচকের মান, অর্থনৈতিক বৈষম্য যেসব দেশে বেশি, তাদের চেয়ে ভালো। আয় বৈষম্য মাপার সূচক গিনি কোইফিশিয়েন্টের কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। আয়ের সাম্য যেভাবেই মাপা হোক না কেন, যদি সমাজে বৈষম্যের মাত্রা বেশি হয়, তবে প্রত্যেককেই তার মাশুল গুনতে হয়। যে সমাজে বৈষম্য বেশি সেখানে অবশ্যই দরিদ্রদের বেশি মাশুল দিতে হয়। কিন্তু সেখানকার ধনীদেরও আয়ের সাম্য বেশি যে সমাজে, সেখানকার ধনীদের তুলনায় বেশি মাশুল দিতে হয়। এই ছবিটা মাথা পিছু জিডিপি-র মান যাই হোক না কেন সব দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা যদি জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা করি সেক্ষেত্রে কিংবা আরও অনেক তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রেও আমরা একই ছবি পাব। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কোনো সমাজে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগের সুফল তখনই প্রত্যাশিত মাত্রায় পাওয়া যাবে যদি সেই সমাজে সাম্যের মাত্রা ভালো পরিমাণে বিরাজ করে। এই সত্যটা খুব সহজেই নানাভাবে বোঝা যায়। যেমন ধরুন, মুম্বই শহরে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বাড়িটিতে দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটি বাস করতে পারেন, কিন্তু তাঁর বাড়ির পাশের বস্তিগুলি থেকে যদি সংক্রামক রোগের জীবাণু ছড়াতে থাকে তবে তিনি বা অন্য কেউ সেই রোগের সংক্রমণ থেকে নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত রাখতে সমর্থ হতে নাও পারেন। সুতরাং সমাজে যদি বৈষম্য বিরাজ করে, তবে ডেঙ্গু বা চিকনগুনিয়া বা মশাবাহিত অন্য কোনো রোগ অথবা অন্য যেকোনো, শুধুমাত্র সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকী দীর্ঘস্থায়ী রোগের (chronic diseases) ক্ষেত্রেও সব শ্রেণির মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং আমরা যদি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, সাম্যের সমাজ বৈষম্যের সমাজের চেয়ে ভালো, তবেই আমরা সামাজিক সংহতির নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। অর্থাৎ, আমরা এমন এক সমাজে বাস করব যেখানে দেশের সবাই কিংবা বিশ্বের সবাই সামাজিক সংহতিতে বিশ্বাস করবে। এই সামাজিক সংহতির ভাবনাই হল সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ভিত্তি, কেননা সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার গোড়ার কথা হচ্ছে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার সমগ্র অংশকে একটা অখণ্ডরূপে দেখা। এখন এই সমষ্টির প্রত্যেকেই একসাথে অসুস্থ হয়ে পড়বে না। কিছু লোক হয়তো একসাথে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সুস্থ থাকবে। কিন্তু সবাই যদি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কিছু কর দেয় বা স্বাস্থ্য বিমা করায় (কর ও স্বাস্থ্য বিমার মধ্যে পার্থক্য পরে আলোচনা করব), তাহলে কোনো এক সময়ে যারা অসুস্থ হয়ে পড়বে, তাদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান আসবে সেসময় যারা সুস্থ থাকবে তাদের দেয়া কর বা স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামের টাকা থেকে। অবশ্য কোনো ব্যক্তি তিন বছর ধরে সুস্থ থাকার পর

চতুর্থ বছরে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু সাধারণত যেকোনো সমাজে সুস্থ লোকেরাই অসুস্থদের চিকিৎসাব্যয়ে ভরতুকি জোগায়। যদি কোনো দেশে প্রগতিশীল কর-কাঠামো থাকে, সেখানে ধনীরা বেশি হারে কর দেবে এবং এই কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যদি স্বাস্থ্যখাতে ঠিকমত বিনিয়োগ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে ধনীদের কাছ থেকে আদায় করা কর গরিবদের চিকিৎসায় ভরতুকি দিতে ব্যবহার করা যাবে। এটাই হল সংহতির ভিত্তি, যা কিনা সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পকে নিশ্চিত করবে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের ভাবনার উদ্ভবের পিছনে ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে সামাজিক বৈষম্য, বৈষম্যের কারণে উদ্ভূত স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা এবং আরও নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সক্রিয় প্রতিবাদ আন্দোলন। তৎকালীন জার্মানির চ্যান্সেলার বিসমার্ক বুঝেছিলেন যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন, না হলে সমাজে বিস্ফোরণ ঘটবে। সেইজন্য তিনি স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প শুরু করেছিলেন এবং যা শেষ পর্যন্ত জার্মানিতে সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের ভাবনার সূচনা করল। পরবর্তীকালে বেভারিজ (Beveridge) রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের (UK) শ্রমিকদলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অ্যানুরিন বেভান (Aneurin Bevan) সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ভাবনাকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার (National Health Service) সূচনা করেন। কিন্তু আবার বলছি যে সামাজিক সংহতি ও বিপ্রতীপ ভরতুকি দানের (cross subsidization) নীতিই সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের ভিত্তিমূল। বিসমার্কের অবশ্য অন্যান্য বিবেচনাও ছিল। প্রথমত, তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো যেন আরও প্রতিবাদী না হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেছিলেন যে শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থায় জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সুস্থ সবল তরুণদের জোগান নিশ্চিত করা দরকার। তৃতীয়ত, তিনি বুঝেছিলেন যে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা হচ্ছে এমন এক প্রকল্প যা নিশ্চিত করবে যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়ার জন্য দেশের নাগরিকরা যেন কোনো আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে না পড়ে।

সেনাবাহিনীতে স্বাস্থ্যবান তরুণদের জোগান নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু মূল কারণটা ছিল সামাজিক অস্থিরতা এবং তারই ফলশ্রুতিতে জার্মানিতে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। এখন লোকেরা বুঝতে পারছে যে দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যই তাদেরকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে হবে। সেইজন্যই অনেক দেশেই সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার। অনেক দেশ স্বাস্থ্যের অধিকারকে তাদের সংবিধানে নাগরিকদের স্বীকৃত অধিকারের মর্যাদা দিয়েছে। কিছু দেশ সবার জন্য স্বাস্থ্যকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দিলেও, রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কাজের অংশ হিসেবে এমন কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা কিনা সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার আদলেই তৈরি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা কী? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা হচ্ছে এমন এক প্রকল্প যা নিশ্চিত করবে যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়ার জন্য দেশের নাগরিকরা যেন কোনো আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে না পড়ে, কিংবা চিকিৎসাজনিত খরচ সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে যেন কোনো সমস্যায় না পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মূলত তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে: ১. আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্য পরিষেবার কার্যক্রমের অধীনে আনা, ২. জনসাধারণকে কোন কোন স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হবে তা চিহ্নিত করা এবং ৩. স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার জন্য জনগণের যা খরচ হবে তার পর্যাপ্ত অংশের দায় রাষ্ট্রকে বহন করবে। এটা নিশ্চিত করা, যাতে চিকিৎসার জন্য ব্যয়ের আর্থিক ঝুঁকি জনসাধারণকে বহন করতে না হয় অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য জনসাধারণের পকেটে চাপ না পড়ে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার এই সংজ্ঞাকে আজকাল WHO cube (হু ঘনক) বলা হয়। এর ঘনকের একটা মাত্রা চিহ্নিত করে জনসংখ্যার কত অংশ স্বাস্থ্য পরিষেবার অধীনে আছে, অপর মাত্রা চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য পরিষেবার ধরনকে এবং তৃতীয় মাত্রা চিহ্নিত করে এই পরিষেবার খরচকে।

এখন বিষয়টাকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখবে। রাজনীতিবিদদের আগ্রহ থাকবে জনসংখ্যার কত অংশকে স্বাস্থ্য পরিষেবার অধীনে আনা যাচ্ছে সেই ব্যাপারটায়। কেননা যত বেশি মানুষকে এই পরিষেবার অধীনে আনা যাবে তার কৃতিত্ব রাজনীতিবিদরা দাবি করতে পারবেন, ভোট বাক্সে তাদের বেশি সুবিধা হবে এবং সুবিধাভোগী মানুষজন রাজনীতিবিদদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। সে কারণেই অন্ধ্রপ্রদেশে "আরোগ্যশ্রী" প্রকল্প প্রবর্তিত হয়েছিল। এটা ছিল দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষদের কাছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার একটা প্রকল্প, তার আওতায় কিন্তু অন্ধ্রের ৮০% মানুষকেই আনা হয়েছিল। এর ফলে ডা রাজশেখর রেড্ডি নির্বাচনে জয় লাভ করেছিলেন এবং পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য "আরোগ্যশ্রী" প্রকল্পের গুণকীর্তনও করেছিলেন।

হু ঘনকের এর দ্বিতীয় মাত্রা হল কী ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হবে। এই বিষয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একটা ভূমিকা আছে। একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি চেষ্টা করব যত বেশি সংখ্যক রোগীকে যত ভালো চিকিৎসা দেওয়া যায়, সেখানে চিকিৎসার খরচটা আমার বিবেচ্য নয়, কেননা আমি মনে করি যে পরিষেবা দেওয়াটাই আমার মূল কর্তব্য।

আর অর্থনীতির প্রশাসকদের কাজ হল হু ঘনকের এর তৃতীয় মাত্রা, অর্থাৎ চিকিৎসার খরচের দিকটা নিয়ে ভাবা। তাঁরা বলবেন যে হ্যাঁ, নাগরিকদের চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ রাষ্ট্র বহন করবে যাতে চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের কারণে লোকরা আরও গরিব হয়ে না পড়ে। কিন্তু সাথে সাথে তাঁদের এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে এই খাতে ব্যয় যেন রাষ্ট্রের আর্থিক বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়।

সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের এই তিনটি প্রেক্ষিতই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই প্রেক্ষিতগুলোর মধ্যে যে টানাপোড়েন আছে, প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণের জন্য যেকোনো সমাজে তার সুষ্ঠু মীমাংসা করতে হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ যাই হোক না কেন, এটা নজরে রাখতে হবে যে, প্রকল্প রূপায়ণের ফলে সমাজের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষত সমাজের সবচেয়ে দুর্বল শ্রেণির মানুষরা যেন উপকৃত হন।

যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিষেবা প্রকল্পকে পিকাসোর বিমূর্ত কিউবিজিমের ধারণার মতো একটা ঘনকের (cube) সাথে তুলনা করেছে, কিন্তু আমার মনে হয় এটা অনেকটা সেই রুবিক কিউবের মতো যার অনেকগুলো মুখ বা তল আছে, যে তলগুলোকে আমাদের একসাথে মেলাতে হয়। যখন কেউ রুবিক কিউবের তলগুলোকে মেলাতে যায়, তখন তাকে সবচেয়ে দুর্বল অংশের দিকে সবচেয়ে বেশি নজর রাখতে হয়। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। হু ঘনকের সমালোচনায় বলা হয় যে, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পে পরিষেবার মান নিয়ে ভাবা হয় না। এটা অবশ্যই বলা যায় যে পরিষেবা বলতে কত লোক পরিষেবা পাচ্ছে কিংবা কী ধরনের পরিষেবা পাচ্ছে শুধুমাত্র সেটাকেই বোঝায় না, পরিষেবার গুণগত মানকেও বোঝায়। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যেসব সামাজিক উপাদান পরিষেবার গুণগত মানকে নির্ধারণ করে সেগুলোও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সমাজে সবাই বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছে কিনা, সবার বাড়িতেই স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয় আছে কিনা, নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে কিনা, সবার মাথা গোঁজার জন্য বাড়ি-ঘর আছে কিনা, সমাজে মানুষজনের আয়ের পরিমাণ, সমাজে বিভিন্ন লিঙ্গের অনুপাত, নাগরিকদের পুষ্টির মান, প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য প্রত্যেকে পাচ্ছে কিনা, ইত্যাদি। এইসব সামাজিক উপাদানগুলো, স্বাস্থ্যের গুণগত মানের উপর যাদের প্রভাব স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরাসরি পদক্ষেপের তুলনায় বেশি, আমাদের দেশে তাদের অবস্থা কী রকম? এসব কিছুকে আমরা কেমন করে একটা কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসব?

কেউ কেউ সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পকে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য বিমা বলে মনে করেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, সরকার এই প্রকল্পে শুধু আর্থিক সহায়তা দেবে, হয় বিমার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কিংবা কর বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে। কেউ কেউ মনে করেন যে এই প্রকল্পের ব্যাপ্তি অনেক বড়ো। এখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরও অনেক উপাদান-- যেমন স্বাস্থ্য কর্মী, পরিকাঠামো, প্রয়োজনীয় ওষুধের জোগান, পরিচালন ব্যবস্থা, তথ্য ব্যবস্থা এইসব গড়ে তোলা, আবার বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন প্রভৃতি দিকগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে আলোচনার সময় এই পরিভাষাটা (অর্থাৎ সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প) খুবই বিভ্রান্তিকর ও জটিল হয়ে যায়। এর কারণ হল আমরা সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প মানে স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প—এরকম একটা বহুল প্রচলিত ধারণাকে এড়িয়ে চলতে চাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের ধারণার ব্যাপ্তি বিশাল। ইংল্যান্ডের জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পও একধরনের সামাজিক বিমা প্রকল্প। কিন্তু অনেকে ভাবেন যে এটা একটা বেসরকারি বিমা প্রকল্প যা নাকি ব্যক্তি মানুষ কিনে থাকেন। এব্যাপারে আমরা বিভ্রান্তি দূর করতে চাই বলে আলোচনার মুখবন্ধেই উল্লেখ করেছিলাম যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার প্রকল্প, শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিমা নয়। আমাদের দেশের সরকার এই পরিভাষাটা (অর্থাৎ সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প) গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কোনোরকম ব্যাখ্যা ছাড়াই। সুতরাং আমরা কীভাবে একে ব্যাখ্যা করব?

এই প্রকল্পকে আমি তিনটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের সাথে তুলনা করব। একদম ভিতরের বৃত্তটা নির্দেশ করছে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কীভাবে করা হবে। আদর্শগতভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হওয়া উচিত দেশের কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে। কর্মচারীদের জন্য মালিকদের দেওয়া স্বাস্থ্যবিমা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিমাকেও (যারা এটা চাইবে) অর্থ সংস্থানের পরিপূরক হিসাবে ধরা যেতে পারে।

সমকেন্দ্রিক বৃত্তের দ্বিতীয় বৃত্তটি হল স্বাস্থ্য কর্মী, পরিকাঠামো,

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১২ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে স্বাস্থ্য খাতে ভারতবর্ষ তার জিডিপি-র ৩.৮% ব্যয় করেছিল, চিন করেছিল ৫.৪%, মেক্সিকো ৬.১%, জার্মানি ১১.৩%, যুক্তরাজ্য ৯.৩% এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৭%।

প্রয়োজনীয় ওষুধের জোগান, পরিচালন ব্যবস্থা, তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন প্রভৃতি। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য উপাদানগুলোকে (দ্বিতীয় বৃত্ত) আর্থিক উপাদানের (প্রথম বৃত্ত) সাথে যুক্ত করে আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবার একটা কাঠামো গড়ে তুলতে পারি। আর এই কাঠামোটাকে তৃতীয় বৃত্ত অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেবার সামাজিক পরিকাঠামো (বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয়, মাথা গোঁজার জন্য বাড়ি-ঘর, দূষণমুক্ত পরিবেশ, পুষ্টির হার, খাদ্যের জোগান ইত্যাদি) দিয়ে ঘিরে দিলেই আমরা সবার জন্য স্বাস্থ্যকে নিশ্চিত করতে পারব। কেননা, এই সামাজিক পরিকাঠামোগুলো ছাড়া সবার জন্য স্বাস্থ্যকে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য খাতে অর্থ বরাদ্দের অবস্থা (যা নিঃসন্দেহে মূল চালিকা শক্তি) কী রকম এবং আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের হাল খারাপ কেন? ইতিমধ্যেই ডা. অরুণ সিং বলেছেন যে ভারতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ খুবই কম। কতিপয় অর্থনীতিবিদ তর্ক করে বলেন যে দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি যখন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের বাইরের কিছু নিয়ামকের (যেমন পুষ্টি, পানীয় জল) উপর নির্ভর করে এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা অর্থ যখন ঠিকমতো খরচ হয় না, তখন আমরা কেন এই খাতে বিনিয়োগ আরও বাড়াব? এই ধরনের যুক্তি সম্পর্কে পরে আলোচনা করব। এখন আমরা কিছু দেশের পরিসংখ্যান নিয়ে

তুলনামূলক আলোচনা করব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১২ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে স্বাস্থ্য খাতে ভারতবর্ষ তার জিডিপি-র ৩.৮% ব্যয় করেছিল, চিন করেছিল ৫.৪%, মেক্সিকো ৬.১%, জার্মানি ১১.৩%, যুক্তরাজ্য ৯.৩% এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর ১৭%। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে তাদের জিডিপি-র ১৮.২০% স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা সত্ত্বেও তার সুফল পাচ্ছে না। সুতরাং এই ব্যাপারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কোনো ভালো উদাহরণ নয়। আবার ভারতবর্ষ যে তার জিডিপি-র ৩.৮% স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করেছিল সেটাও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আদর্শ উদাহরণ নয়, স্বাস্থ্য সূচকের দিক থেকে খুবই নীচের দিকে ভারতের অবস্থান। বিগত বছরগুলোতে মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকে ভারতের স্থান ১৩০ থেকে ১৩৬ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এর প্রধান কারণ হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমাদের অবহেলা। জিডিপি-র ৬.১% স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করে মেক্সিকো—তার দিকে আমাদের তাকানো উচিত। আবার ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের জিডিপি-র ৯.৩% স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করার পিছনে রয়েছে তাদের জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের (NHS) অস্তিত্ব।

কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণের থেকেও গুরুত্বপর্ণ হল কীভাবে এই অর্থ খরচ করা হচ্ছে এবং কোথা থেকে এই অর্থের জোগান আসছে? আপনারা যদি স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের তথ্য বিচার করেন তবে দেখবেন যে ২০১২ সালে ভারত সরকার ব্যয় করেছিল মোট খরচের ৩০.৫%, চিন ৫৬%, মেক্সিকো ৫১.৮%, জার্মানি ৭৬.৭%, যুক্তরাজ্যের সরকার ব্যয় করেছিল ৮৪% (NHS সহ)। কিন্তু সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেখানে নাকি বেসরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের রমরমা সেখানেও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় ছিল ৪৭%, অথচ ভারতবর্ষের সরকার খরচ করেছিল ৩০%। স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের অপ্রতুলতার কারণেই আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই দুর্দশা। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা দেশের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ক্রমশ সংকুচিত করে তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি, আর তার ফলে বিনিয়ন্ত্রিত ও অসংবেদনশীল বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিনে দিনে বৃদ্ধি ঘটছে। সঠিক পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (regulatory system) অভাবে আমরা এই মিশ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারছি না এবং সেই কারণেই যেটুকু টাকা খরচ করছি সেটুকুর অনুপাতে আকাঙ্ক্ষিত ফল আমরা পাচ্ছি না। এছাড়া আমরা দেখছি যে স্বাস্থ্য খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ অনেক সময় খরচ হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পুরোপুরি খরচ না হওয়ার পিছনে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলোতে বরাদ্দকৃত অর্থ দেরিতে পাঠানো কিংবা রাজ্যের সদর দপ্তর থেকে ট্রেজারিতে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে দেরি করে পাঠানোর ব্যাপারগুলো তো আছেই। কিন্তু যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দক্ষতার ঘাটতি থাকে, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব থাকে, পরিকাঠামোয় যদি যথেষ্ট বিনিয়োগ না হয়, সরকারি হাসপাতালগুলোতে অত্যাবশ্যক ওষুধ, টিকা ইত্যাদি কেনা না হয়, তবে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকে না। বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে না পারার কারণে কেন্দ্র রাজ্যগুলোকে আর টাকা দিতে চায় না, কিন্তু স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করে রাজ্যগুলোর খরচ করার ক্ষমতা বৃদ্ধিরও কোনো চেষ্টা করে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভূমিকা প্রসঙ্গে সেই প্রবাদের কথা মনে পড়ে-"যেহেতু শিশুটা অসুস্থ, তাকে আর খাবার দিও না।"

আমাদের পরিকল্পনাবিদরা এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে স্থির করলেন, যে অর্থ সরকারি ক্ষেত্রে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকছে তা দিয়ে স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালু করা যেতে পারে। সরকার স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালু করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলোকে টাকা দেবে। নাগরিকরা ঠিক করবেন তাঁরা কোন সংস্থায় (সরকারি না বেসরকারি) বিমা করবেন এবং এইভাবেই তারা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (RSBY) বা আরোগ্যশ্রী বা অন্য কোনো স্বাস্থ্য বিমায় নথিভুক্ত হবেন। এইভাবেই সরকার তার দায়িত্ব পালন করবে। এই ধরনের ভাবনাচিন্তায় কি কোনো সমস্যা আছে? রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা বা আরোগ্যশ্রী বা রাজ্য সরকারগুলোর যেকোনো স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প (রাজ্য সরকারের এই বিমা প্রকল্পগুলোর নাম আবার মুখ্যমন্ত্রী পালটানোর সাথে সাথে পালটে যায়) খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে এইসব বিমা প্রকল্পগুলোতে কেবলমাত্র হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ বিমা সংস্থাগুলো মিটিয়ে দেয়, তাও পুরো খরচ

ভারতবর্ষে চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের ৭২% হচ্ছে বহির্বিভাগে চিকিৎসার খরচ, বিশেষত ওষুধের পিছনে খরচ।

নয়। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় বিমাকারীরা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করালে চিকিৎসার খরচ বাবদ বছরে সর্বাধিক ৩০০০০ টাকা পান, চিকিৎসার পুরো খরচ নয়। হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন সর্বাধিক ৩০০০০ টাকার অতিরিক্ত অন্য যেকোনো খরচ, হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার খরচ, পরবর্তীকালে চিকিৎসকের ফি, প্রয়োজনীয় ওষুধ কিংবা পরীক্ষানিরীক্ষার খরচ, এগুলোর কোনোটাই পাওয়া যায় না। অথচ দেখা গেছে ভারতবর্ষে চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের ৭২% হচ্ছে বহির্বিভাগে চিকিৎসার খরচ, বিশেষত ওষুধের পিছনে খরচ। চিকিৎসার এইসব খরচের বোঝা যদি আমরা লাঘব করতে না পারি তবে আদপে আমরা কোনোরকম আর্থিক সহায়তাই প্রদান করছি না। এই ধরনের বিমা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে কিছু অংশের মানুষ হয়তো কিছু স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পায়, কিন্তু চিকিৎসার সর্বনাশা ব্যয়ভার কমানো সম্ভব হয় না, সমাজের গরিব মানুষদের কোনোরকম আর্থিক সুরক্ষা দেওয়া যায় না। আমাদর দেশে প্রতি বছর ৫০ মিলিয়ন মানুষ চিকিৎসা খাতে সাধ্যের বাইরে খরচ করার ফলে দরিদ্র হয়ে পড়ে। আমি আগেই বলেছি, আমাদের দেশে চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের ৭০% আসে বেসরকারি খরচ থেকে, প্রকৃতপক্ষে ব্যয়ের ৬১% আসে ব্যক্তিগত খরচ থেকে, আর ৯% আসে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প থেকে। এই চিত্রটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় সবচেয়ে খারাপ। চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে, সরকারি অর্থের জোগানের নিরিখে পৃথিবীতে আমাদের

স্থান একদম নীচের দিকে, আবার ব্যক্তিগত খরচের নিরিখে পৃথিবীতে আমাদের স্থান সবার উপরে। তা সত্ত্বেও আমরা এখনও আশা করি যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ভালো স্থানে থাকবে! বস্তুত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের স্থান কেবলমাত্র শ্রীলঙ্কার চেয়ে খারাপ তা নয়, আমরা বাংলাদেশ, নেপাল ও আরও অনেক দেশের থেকে পিছিয়ে আছি এবং এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই।

আমরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অবজ্ঞা করে এসেছি। সবরকম স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পেরই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপারে আগ্রহ নেই, কেননা সেক্ষেত্রে অনেক রোগের চিকিৎসাই বিমার অন্তর্ভুক্ত হবে, ফলে বিমাকারীদের দাবির পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং বিমা সংস্থাগুলোর মুনাফা খুবই কম হবে। অপরপক্ষে রোগের সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে বিমা কোম্পানিগুলোর মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ আরও বেড়ে যাবে। সেইজন্যই বিমা কোম্পানিগুলো প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বিমার অন্তর্ভুক্ত করতে চায় না। সরকার যদি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তিশালী না করে তবে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরবর্তী দুই স্তরের (যথাক্রমে secondary এবং tertiary care) ওপর চাপ বাড়বে ও তাদের মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি দেশে সুসংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা থাকে এবং তার সাথে ধারাবাহিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের চিকিৎসারও বন্দোবস্ত থাকে, তাহলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে দ্বিতীয় (secondary care) ও তৃতীয় স্তরের (tertiary care) স্বাস্থ্য পরিষেবার কার্যকরী যোগসূত্র স্থাপিত হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার কেন্দ্রগুলো দক্ষ দ্বাররক্ষীর ভূমিকা পালন করবে। এই কেন্দ্রগুলোতে যত বেশি সম্ভব রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করা হবে এবং যতটা সম্ভব প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে রোগীকে জেলা হাসপাতাল বা অন্য কোনো হাসপাতালে পাঠানো হবে। এখন যদি সরকারের এই ধরনের পারস্পরিক সংযোগ ব্যবস্থা না থাকে তবে রোগীরা বলির পাঁঠা হয়ে বেসরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবে এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলো দ্বিতীয় (secondary care) কিংবা তৃতীয় স্তরের (tertiary care) চিকিৎসার জন্য যেকোনো অঙ্কের টাকা ধার্য করে বসবে। সেকারণে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আমরা এমন একটা ব্যবস্থা চাই যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলা হাসপাতাল ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, অর্থাৎ তিন স্তরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো অত্যন্ত কার্যকরীভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকবে। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যে যারা গ্রাম বা শহরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসা পাবে, তাদের অধিকাংশই ভবিষ্যতে সুস্থ থাকবে। চিকিৎসার জন্য যখন তাদের জেলা হাসপাতাল বা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাবার প্রয়োজন হবে, তখন তারা সেখানে যাবে এবং চিকিৎসা শেষে আবার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফিরে আসবে। কিন্তু আমাদের দেশে এটা ঘটেনি। যুক্তরাজ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পে (NHS) এই নীতি কিছুটা অনুসরণ করা হয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কাইজার পার্মানেন্টি [১] নামে স্বাস্থ্য পরিষেবার একটা সংস্থা আছে, যা কিনা কিছু কিছু রাজ্যে স্বাস্থ্য বিমার সাথে সাথে স্বাস্থ্য পরিষেবাও প্রদান করে, তারাও এই নীতি অনুসরণ করে। কাইজার পার্মানেন্টির যে শাখা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে তারা রোগ প্রতিরোধের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়, যাতে কিনা রোগী দ্রুত গুরুতর অসুস্থ হয়ে না পড়ে এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসার কারণে রোগী তাদেরকে ছেড়ে চলে না যায়।

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্যের উদ্দেশ্য হল নাগরিকদের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখা, তাদের অসুস্থ করে তোলা নয়। ভারতবর্ষে যদি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলা হাসপাতাল (অর্থাৎ secondary care centre) ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলোর (অর্থাৎ tertiary care centre) মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, তবে secondary ও tertiary care centre গুলো প্রত্যেক রোগীকে, রোগীদের স্বাস্থ্য বিমাকে ব্যাঙ্কের ATM-এর মতো ব্যবহার করবে এবং তাদের থেকে খুশিমতো টাকা আদায় করবে। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাই ঘটে চলেছে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। চিকিৎসার খরচ ও মানের ব্যাপারে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আমাদের ভুগতে হচ্ছে। এছাড়াও বেসরকারি মেডিকাল কলেজের সংখ্যার বৃদ্ধিও আমাদের দুর্ভোগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমানে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আমাদের দেশের ক্রিকেট খেলার সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা BCCI-কে দুর্নীতিমুক্ত করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। আমি আরও খুশি হতাম যদি তারা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে (MCI) দুর্নীতিমুক্ত করার কোনো উদ্যোগ নিতেন, কেননা BCCI-এর চেয়ে MCI-তে দুর্নীতির কারণে ভারতের বেশিসংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। সেই কারণেই আমি মনে করি আমাদের দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আরও মৌলিক সংস্কারের দিকে আমাদের নজর দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই ব্যাপারে সবার এগিয়ে আসা দরকার।

সে কারণেই অধুনা বিলুপ্ত পরিকল্পনা কমিশনের সবার জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের যে উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল ছিল, তার কমিটি মিটিং-এ আমরা বলেছিলাম যে ২০১২-২০১৭ সাল-এর পঞ্চবার্ষিকী

---

১ কাইজার পারমানেন্টি (KP) হল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের একটি কনসোর্টিয়াম, যার সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ওকল্যান্ডে। ১৯৪৫ সালে মার্কিন শিল্পপতি হেনরি জে কাইজার এবং সিডনি গারফিল্ড নামে একজন চিকিৎসক এই কনসোর্টিয়ামটি প্রতিষ্ঠা করেন। কাইজার পারমানেন্টি কনসোর্টিয়ামের অধীনে তিনটি পৃথক সংস্থা আছে। এগুলো হল-কাইজার ফাউন্ডেশন হেল্থ প্ল্যান, কাইজার ফাউন্ডেশন হসপিটালস এবং পারমানেন্টি মেডিক্যাল গ্রুপস্। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮ টি রাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া জুড়ে এর কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব বড়ো সংস্থা বিনা মুনাফার উদ্দেশ্য নিয়ে চলে, এটি তাদের অন্যতম। পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কাইজার পারমানেন্টির খুব খ্যাতি আছে। এখানকার ডাক্তারবাবুরা সবাই মাইনে পান, রোগী দেখার জন্য প্রতি রোগী পিছু ভিজিট ফি পান না। রুগীদের যাতে চিকিৎসার জন্য খরচপাতি কম হয় এবং দামি হাসপাতালে তাদের যাতে বেশিদিন পড়ে থাকতে না হয়, সে কথা মাথায় রেখেই এরা চিকিৎসার পরিকল্পনা করে।

পরিকল্পনার সময়কালে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ জিডিপি-র ১.৪% থেকে বাড়িয়ে ন্যূনতম ২.৫% করা উচিত। আমরা এ কথাও বলেছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পগুলো যেমন-CGHS (Central Government Health Scheme), ESI (Employees' State Insurance), RSBY (Rashtriya Swasthya Bima Yojna), বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বিমা প্রকল্পগুলোকে জুড়ে দিয়ে বড়ো আকারের একটা স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প করতে হবে এবং সরকারও যেন তার রাজস্ব খাতে আয়ের থেকে আরও বেশি পরিমাণে অর্থ এই সুরক্ষা প্রকল্পে প্রদান করে। তাহলেই স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বড়ো আকারের অর্থভাণ্ডার সৃষ্টি হবে এবং সব ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য, বিশেষত জটিল অস্ত্রোপচারের জন্য আরও উন্নত মানের সুযোগসুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে। অনেকেই বলবেন, tertiary স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন কী? সেটা কি খুব ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, সত্যিই তা ব্যয়সাপেক্ষ হবে। কিন্তু ধরুন, উড়িষ্যার কোনো এক যুবককে সাপে কেটেছে এবং তাকে বাঁচানোর জন্য হয় ভেন্টিলেটর অথবা ডায়ালিসিসের প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে কি আমরা বলব যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিষেবা (tertiary care) বলে এগুলো সে পাবে না? ধরুন

সবার জন্য স্বাস্থ্যের সুযোগ কাগজ-কলমেই থেকে যাবে যদি না আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজনীয় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী তৈরি করতে পারি।

একজন মহিলার সন্তান প্রসবের সময় কোনোরকম ত্রুটির কারণে জরায়ুতে ফুটো হয়েছে অথবা পরবর্তীকালে জননেন্দ্রিয়তে ভগন্দর (vesicovaginal fistula) হয়েছে, সেক্ষেত্রে কি আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিষেবা (tertiary care) দেওয়া যাবে না বলে তাঁকে ফিরিয়ে দেব? সুতরাং কিছু কিছু সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিষেবা (tertiary care) আছে যেক্ষেত্রে আমাদের নমনীয় হতে হবে, যেমন শিশুদের লিউকোমিয়া। অবশ্যই আমাদের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ, শুরুতেই আমরা সব ধরনের রোগের চিকিৎসা এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনতে পারব না। সবার জন্য উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা (Universal Health Coverage, সংক্ষেপে (UHC) পৌঁছে দিতে হয়তো আমাদের আরও এক কিংবা দুই দশক অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু UHC-এর বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে বিশেষত সমাজের সবচেয়ে দুর্বলদের কাছে, যেমন— গরিব, নারী ও শিশুদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা। যদি আমরা সেটা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে ন্যায্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ঠিকমতো পরিকল্পনা করতে পারব এবং আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

একই সঙ্গে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী তৈরির জন্যেও আমাদের বিনিয়োগ করতে হবে। সবার জন্য স্বাস্থ্যের সুযোগ কাগজ-কলমেই থেকে যাবে যদি না আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজনীয় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী তৈরি করতে পারি। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আমাদের ডাক্তার নির্ভর হওয়ার দরকার নেই। বস্তুত সামনের সারির বিশাল সংখ্যক প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন স্বাস্থ্যকর্মী, যেমন নার্স বা সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মী (community health workers), তাঁরা গ্রামে এমনকী শহরেও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকাংশ কাজগুলো করতে পারবেন। যদি মাঝেমধ্যে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তারও ব্যবস্থা করা যায়। মজার কথা হল, দেশের অর্থনীতিতে মন্দা চলছে বলে আমরা হা-হুতাশ করি, অর্থনীতির হাল ফেরানোর জন্য আরও চাকরি সৃষ্টি হওয়া দরকার বলে মনে করি। অথচ আমাদের দেশে যথেষ্ট সংখ্যায় স্বাস্থ্যকর্মী কম। আমাদের দেশে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী তৈরির জন্য কেন বিনিয়োগ হচ্ছে না? কেন আরও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, সাধারণ ডাক্তার, নার্স, পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী, সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মী তৈরির জন্য বিনিয়োগ হচ্ছে না? এই উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ হলে কম বয়সীদের জন্য, বিশেষত মহিলাদের জন্য অনেক কর্মসংস্থান হবে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রবীণদের তুলনায় নবীনেরা সংখ্যায় বেশি। ফলত, কাজের সন্ধানে শ্রমের বাজারে প্রতি বছর বিশাল সংখ্যায় কর্মক্ষম নবীন হাজির হয়। সেক্ষেত্রে যদি এই কর্মক্ষম নবীনদের ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়, তবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর চাহিদা পূরণ করা যাবে এবং এই কর্মসংস্থান দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করবে। কিন্তু এর জন্য রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো উপদেশ দেবেন যে সামজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টি হয় না, কেবলমাত্র উৎপাদন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমেই তা সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র কর্মসংস্থান ও ভোগব্যয়ের বৃদ্ধিই ঘটে না, মানবজীবনের মানও উন্নত হয়; ফলত তাদের উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই ভাবনাগুলো আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রোথিত করতে হবে। তা করতে হলে দেশের সব অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা বলেছি দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর জোগান বাড়াতে হবে। এরপর বলেছি যে, অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র ও রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষানিরীক্ষার খরচ যদি সরকার বহন করে, যা কিনা দেশের জিডিপি-র ০.৫%, তাহলে চিকিৎসাখাতে ব্যক্তিগত ব্যয়ের অঙ্কটা যথেষ্ট পরিমাণে কমানো যাবে। এই পদক্ষেপগুলো নিলে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি লোকেদের আস্থা বাড়বে। তামিলনাড়ুর মডেল অনুসরণ করে রাজস্থান সরকার যখন বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র সরবরাহ শুরু করল, সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসার সুযোগ নেওয়া লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার মানে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি লোকেদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরপর আমরা বললাম যে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর যথাযথ নজরদারি ব্যবস্থা চালু করা হোক, নানা ধরনের স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পগুলোর বদলে সারা

দেশে একটাই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প চালু করা হোক, এমন একটা চুক্তি করা হোক যাতে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থাগুলো দায়িত্বপূর্ণভাবে ও দায়বদ্ধতার সাথে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থাগুলোর পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।

আমরা বলেছি, প্রথমে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। শুধুমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো নয়, জেলা হাসপাতালগুলোকেও শক্তিশালী করতে হবে। জেলাগুলোতে আরও নতুন নতুন মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ স্থাপন করতে হবে। এদেরকে প্রশিক্ষণের মূল কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এরা দ্বিতীয় স্তরের পরিষেবা এবং কিছু পরিমাণে তৃতীয় স্তরের পরিষেবা দিতে পারে।

আমরা সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership, সংক্ষেপে PPP) কথা বলেছি। কিন্তু PPP মানে বেসরকারি ক্ষেত্রের মুনাফা নয়। PPP-র মানে হওয়া উচিত সাধারণের মঙ্গলের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব। PPP-র ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল—প্রথমে সরকারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হোক, তারপর ব্যাখ্যা করা হোক এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে কী কী পরিষেবা দেওয়া হবে এবং কীভাবে এই ব্যবস্থার দায়বদ্ধতা ঠিক করা হবে। PPP-র ব্যাপারে আমাদের সুপারিশে সব দিকগুলোই বিবেচনা করেছি। আমরা বলেছি যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় স্তরেই শক্তিশালী নজরদারি ব্যবস্থা থাকা দরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাস্তবে এই সুপারিশগুলোর কোনোটাই মানা হয়নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে, এখন থেকে স্বাস্থ্যের বেশিরভাগ বিষয়ের দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলোকে নিতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার শুধু পরিকাঠামো আর শক্তির দায়িত্ব নেবে। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের বেশিরভাগ অংশের দায়িত্ব কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি অর্থ কমিশন সুপারিশ করেছে যে, এযাবৎ কেন্দ্র তার কর বাবদ সমগ্র আয়ের যে ৩২% রাজ্যদের মধ্যে বণ্টন করত তা ১০% বাড়বে। অর্থাৎ, কেন্দ্রের কর বাবদ সমগ্র আয়ের ৩২%-এর পরিবর্তে ৪২% রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টন করবে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের ওই সুপারিশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যগুলোর আয় বৃদ্ধির ব্যাপারটা খুবই কাল্পনিক ও গোলমেলে। কেননা, পরিকল্পনাখাতে রাজ্যগুলো কেন্দ্র থেকে যে আর্থিক সহায়তা পেত তা অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রকৃত বৃদ্ধি ১০% নয়, প্রায় ৩% হয়েছে। কিন্তু এই প্রান্তিক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কোথাও কি এমন নিশ্চয়তা আছে যে রাজ্যগুলো এই অতিরিক্ত অর্থ স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ব্যয় করবে এবং যদি তা করেও তবে কি সেই অর্থ রাজ্যগুলোর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তিশালী করবার জন্য ব্যবহৃত হবে? আমাদের কাছে তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে একটা কাঠামো আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন। প্রতিটি রাজ্যের নিজেদের জন্য আলাদা করে কোনো কাঠামোর প্রয়োজন নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকা ভালো, কিন্তু এর ফলে উন্নত রাজ্যগুলো কেন্দ্র থেকে পাওয়া অনুদানের সদ্ব্যবহার করে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাবে আর গরিব রাজ্যগুলো ক্রমশ পিছু হটতে থাকবে। ফলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে বৈষম্য বাড়তেই থাকবে। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটা কেন্দ্রীয় কাঠামোর বদলে রাজ্যে রাজ্যে পৃথক কাঠামো থাকলে এক রাজ্যের লোক অন্য রাজ্যে গেলে পরিষেবা ভোগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। একজন ভারতীয় হিসাবে দেশের যেকোনো জায়গাতেই সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ (যা সবাইকে দেওয়া হবে বলেই আমাদের আশা) তা সমানভাবে পাওয়া উচিত। আমি যদি

সামাজিক সাম্য ও সংহতির আদর্শকে প্রকল্পের মূল নীতি হিসাবে গণ্য করতে হবে, কেননা এই আদর্শ ছাড়া সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যকরী হওয়া অসম্ভব।

চেন্নাইতে জন্মাই, হায়দ্রাবাদে লেখপড়া করি, দিল্লিতে চাকরি করি এবং কোনো কাজে মুম্বাই যাই, তখন কিন্তু এটা নিশ্চিত থাকা দরকার যে সব জায়গাতেই আমি এবং আমার পরিবার একইভাবে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাব। এটা কখনোই হওয়া উচিত না যে তেলেঙ্গানা রাজ্যের অধিবাসী হয়ে আমি রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করা মাত্র সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। এসব কারণেই আমাদের প্রয়োজন একট সুচিন্তিত সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প, যা কিনা জাতীয় প্রকল্পের কাঠামোর মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকবে, অথচ তার মধ্যে রাজ্যভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণের সুযোগ থাকবে। রাজ্যভিত্তিক বৈশিষ্ট্য বলতে আমি বোঝাতে চাইছি যে বিহার কালাজ্বরের ব্যাপারে বিশেষ কোনো পরিষেবা চাইতে পারে, কেরালা হৃদ্‌রোগের ব্যাপারে বিশেষ কোনো পরিষেবা চাইতে পারে, সেটা মেনে নিতে কোনো অসুবিধে নেই। অর্থাৎ, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পে রাজ্যভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ সম্ভব, কিন্তু কাঠামোতে যতদূর সম্ভব সাযুজ্য বজায় রাখতে হবে। এই প্রকল্পের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারি অর্থের জোগানের বিষয়টার দিকে নজর রাখতে হবে, কারণ অর্থ জোগানের নিশ্চয়তার ওপরই সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রকল্প তৈরির সময় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা এই পরিষেবাই সমগ্র স্বাস্থ্য পরিষেবার ভরকেন্দ্র। সামাজিক সাম্য ও সংহতির আদর্শকে প্রকল্পের মূল নীতি হিসাবে গণ্য করতে হবে, কেননা এই আদর্শ ছাড়া সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যকরী হওয়া অসম্ভব। না হলে, প্রত্যেকে যদি শুধু তার নিজ নিজ স্বার্থকেই প্রাধান্য দেবে, তাতে দেশের বিশাল অংশের মানুষের কাছে এই প্রকল্প কোনোরকম ন্যায্যতা পাবে না। মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে শুধুমাত্র গরিবরাই নয়, গরিবি সীমার ওপরে থাকা মানুষদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। মধ্যবিত্তশ্রেণির অধিকাংশ লোকই চিকিৎসা-ব্যয়, বিশেষত বিপর্যয়কারী ব্যয় বহন করতে পারেন না।

গত বছর এপ্রিল মাসে হিন্দু পত্রিকায় ছোট্ট করে প্রকাশিত একটা খবরের কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমার যতদুর মনে পড়ে খবরটা ছিল এইরকম—উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ জেলায় এক আদিবাসী পরিবারে বাবা তাঁর দু মাস বয়সের পুত্র সন্তানকে সাতশো টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন তাঁর অসুস্থ স্ত্রীর জন্য ওষুধ কিনবেন বলে। বিনা মূল্যে চিকিৎসার পরিষেবা পাওয়ার জন্য ওই আদিবাসী পরিবারের কোনো বিমা ছিল না, থাকলেও তার কথা পরিবারের কেউ জানতেন না।

এখন ভাবুন ওই আদিবাসী বাবাকে কীরকম হৃদয়বিদারক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছিল! দুমাসের সন্তানের কথা ভাববেন, না কি অসুস্থ স্ত্রীর কথা ভাববেন? স্ত্রীর চিকিৎসা করার জন্য তিনি তাঁর শিশু সন্তানকে পাশের গ্রামের একজনের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা কতটাই ঠুনকো। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছাচ্ছে না। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা এটা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে যে একজন অসুস্থ মা তাঁর চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারেন, আর তার জন্য যেন নিজের শিশু সন্তানকে বিক্রির মতন মর্মান্তিক ব্যাপারের আশ্রয় না নিতে হয়। এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা সম্ভবত ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশে চিকিৎসার ব্যয় সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে অনেক পরিবারেই এরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে থাকে।

অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে দেশের মানুষদের ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে, শুধুমাত্র এই কারণেই আমরা সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবি করছি তা নয়। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া হচ্ছে সব নাগরিকের অধিকার—এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা 'সবার জন্য স্বাস্থ্যের' দাবিতে মুখরিত হচ্ছি। আমরা যদি মনে করি যে, সামাজিক ঐক্য ও সাম্যের নীতিকে ভিত্তি করেই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে, তাহলে বলা যায় যে যতদিন না আমরা সমাজে ঐক্য ও সাম্য নিশ্চিত করতে পারছি, ততদিন আমাদের সমাজকে প্রকৃত সভ্য সমাজ বলতে পারব না। সামাজিক সাম্য বলতে শুধুমাত্র 'সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া' বোঝায় না। সবাইকে স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ দেওয়া হল, ফলে আপনি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করার সুযোগ পেলেন। এটাকে আপনি 'সমান সুযোগ' বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু যে শিশু দারিদ্র্যের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে, যে দারিদ্র্যের পরিবেশে বড়ো হচ্ছে, যে অপুষ্টিতে ভুগছে, যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকছে, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তার কাছে 'সুযোগের সমতা' কথাটা নিষ্ঠুর তামাশা। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ R.H.Tawney ১৯৩১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Equality*-তে 'সুযোগের সমতা' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন -"With massive inequalities, where many are denied an adequate education, unable to access effective health care and housed in slums, equality of opportunity is nothing more than a cruel jest—the impertinent courtesy of an invitation offered to unwelcome guests, in the certainty that circumstances will prevent them from accepting it."

তিনি বলেছিলেন যে জীবনদৌড়ে প্রত্যেকের জন্য শুধু রাস্তা খোলা রাখলেই চলবে না, প্রত্যেককে সমানভাবে শুরু করতেও দিতে হবে। সুতরাং আমাদের দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে সমাজের প্রত্যেকের কাছেই স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় এবং প্রত্যেকেই যেন সমান অবস্থায় শুরু করতে পারে। এটাই হল সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবির মূল কথা।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কে শ্রীনাথ রেড্ডি প্রখ্যাত হৃদ্‌রোগবিদ। পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া-র প্রধান। ২০১০ সালে যোজনা কমিশন-গঠিত সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান ছিলেন।

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

সর্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবার দাবির সঙ্গে আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও আমাদের সোচ্চার হতে হবে

ডা. অরুণ সিং ২০১৬ সালের ২০১৬ সালের ২৪ জানুয়ারি শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ডাকা 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিয়ে সভায় যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেটির লিখিত রূপ এখানে রাখা হল।

আগামী দিনে আমাদের স্বাস্থ্য কোন পথে এগোবে তা নিয়ে আলোচনা করতে আজকে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ডাকা সভায় আমরা সম্মিলিত হয়েছি। এই বিষয়ে যাওয়ার আগে আমি তিনটে প্রশ্ন আপনাদের করব। আপনারা যাঁরা এখানে বসে আছেন তাঁরা কি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার (Universal Health Care) অর্থ হচ্ছে স্বাস্থ্য কোনো ব্যাবসা হবে না, স্বাস্থ্য কোনো শিল্প হবে না, সব চিকিৎসাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমি পাব। এটা কিন্তু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেকোনো কর্মসূচি গ্রহণের পিছনে একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। দৃষ্টিভঙ্গিটায় যদি ভুল থাকে, তবে কর্মসূচি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ভুল হবে। কর্মসূচির প্রয়োগ নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করি, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা নিয়ে নয়। আচ্ছা, আমরা তো মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলছি। ধরুন, এই পৃথিবীতে তো অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে যারা মানুষের কাছাকাছি, অনেক জন্তুজানোয়ার আছে তাদেরও তো স্বাস্থ্য আছে, তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যের কী পার্থক্য? তাদেরও হার্ট আছে, হার্টের রোগ হয়। তাদেরও হার্টের শল্যচিকিৎসা করতে হয়। মানুষেরও হার্ট আছে। শুয়োরের হার্ট আর মানুষের হার্টের মধ্যে অনেকটাই মিল আছে। তাহলে একজন মানুষের হার্ট যিনি শল্যচিকিৎসা করছেন আর আরেকজন যিনি শুয়োরের হার্টের শল্যচিকিৎসা করছেন, তাঁদের দুজনের মধ্যে কী তফাত? দুজনেই কি এক? অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই কিছু দক্ষতা, কিছু যন্ত্র, কিছু জ্ঞান থাকলেই কি এক? তাহলে স্বাস্থ্যের দরকারই বা কেন আমাদের? আমাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কুকুরের স্বাস্থ্যের, বিড়ালের স্বাস্থ্যের, পাখির স্বাস্থ্যের, অনেক প্রাণী আছে এই পৃথিবীতে, তাদের স্বাস্থ্যের কি কোনো পার্থক্য আছে? খুঁজতে খুঁজতে একটা ছবি দেখলাম। কয়েক হাজার বছর ধরে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষ হচ্ছে এমন এক প্রাণী, যার মস্তিষ্ক ও খুলির অনুপাত (ব্রেন-স্কাল রেশিয়ো) সবথেকে বেশি। তার মানে আমরা যখন স্বাস্থ্যের কথা বলি, আমরা কিন্তু বুদ্ধি যার সবথেকে বেশি আছে তার কথা বলি। আমরা যখন একটা শিশুকে খাবার দিচ্ছি, তখন তার শুধু পেটটা ভরার জন্য দেব না, আমরা দেখব তার বুদ্ধির বিকাশও হচ্ছে কিনা? কেননা, বুদ্ধির বিকাশ যদি না হয় সে এই মঞ্চের মধ্যে বা আপনাদের মধ্যে বসে থাকবে না। সে কোথাও কায়িক পরিশ্রম করে একজন খেটে-খাওয়া মজুর হিসেবে বাঁচবে। সে চা-বাগানের শ্রমিক হতে পারে, সে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের চা দেওয়ার লোক হতে পারে, সে কোনো ধাবায় কাজ করতে পারে। যদি

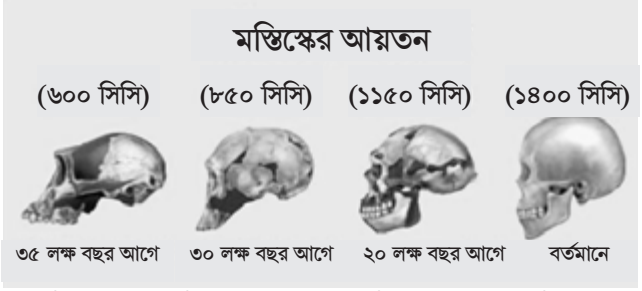

চিত্র ১. মানুষের বিবর্তনের সাথে সাথে মস্তিষ্কের আয়তনের পরিবর্তন

তার মস্তিষ্কের বিকাশ ঠিকমতো হয়, তাহলে আপনার আমার বাড়িতে সে কাজ করতে আসবে না। সেক্ষেত্রে, বুদ্ধি বা ধীশক্তিজনিত শ্রম (কগনিটিভ লেবার) এই দেশে প্রধান হবে। তাহলে যা আমি আলোচনা করব সেখানে কোথাও একটা বুদ্ধির বিকাশের প্রশ্ন আসবে। সেটাই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি।

আমি যেহেতু শিশুদের চিকিৎসক, অনেকদিন ধরে দেখতাম যে একটা বাচ্চা যখন জন্মায় তখন কোনো কিছু হাত দিয়ে ধরতে গেলে সে সম্পূর্ণ হাত বাড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে যখন তার বয়স বাড়ে তখন কিন্তু সে সব আঙুল নয়, শুধু বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে কাজ করে (এটা ৯ মাস বয়সে)। দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের এটা একটা মুদ্রাও বটে। আর আমরা বলি যেদিন বাচ্চাটা এটা করতে শিখল, সেদিন তার বুদ্ধির বিকাশ হয়ে গেল। যেদিন আপনারা জন্মে ছিলেন তখন আপনাদের খুলির মধ্যে মস্তিষ্কের ব্যাস ছিল ৩৪ সেন্টিমিটার। সেটা আজকে ১৮ সেন্টিমিটার বেড়েছে। প্রথম বছরে ১২ সেন্টিমিটার বেড়েছে। দ্বিতীয় বছরে মাত্র ৩ সেন্টিমিটার। তারপরে সারাজীবন মিলে ২-৩ সেন্টিমিটার বেড়েছে। তার মানে কোনো স্কুল নয়, জন্মের প্রথম তিন বছরে একটা শিশুর স্বাস্থ্যের বিকাশের উপরেই নির্ভর করে কোনো দেশ বা জাতি কোথায় যাবে। প্রাণীজগতে এতগুলো যে প্রাণী আছে—গিবন আছে, শিম্পাঞ্জী আছে, মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী এই কাজটা করতে পারে না। একটা মানবশিশু যখন জন্মায় সে শিম্পাঞ্জীর মতো জন্মায়, সমাজ তাকে সাহায্য করে বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে। যেদিন আপনার বাচ্চাটা প্রথম কলম বা পেনসিল ধরে সেদিনটাকে আমরা বলি হাতে-খড়ি। সেদিন কিন্তু আপনি মনে করলেন যে এই বাচ্চা এবার থেকে লেখাপড়া শুরু করবে। এটা না হলে আমরা মনে করি বাচ্চার বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে না।

আজ যাঁরা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আছেন, তাঁরা একলব্যের গল্পটা মনে করুন। দ্রোণাচার্য কিন্তু তাঁর বুড়ো আঙুল নিয়ে নিয়েছিলেন। সে কিন্তু তার শিক্ষা, তার জ্ঞানে একটা জায়গায় পৌঁছেছিল। দ্রোণাচার্য বুড়ো আঙুল নিলেন কেন, অন্য আঙুলও তো নিতে পারতেন। তার কারণ হচ্ছে একমাত্র মানুষই তার বুড়ো আঙুলকে অন্য যেকোনো আঙুলের কাছে নিয়ে গিয়ে যেকোনো জিনিসকে ধরতে পারে, আর কোনো প্রাণী সেটা পারে না। তাহলে বুড়ো আঙুল কেটে নিয়ে নেওয়ার মানে হচ্ছে মানুষকে নিম্নতর প্রাণীতে রূপান্তরিত করা হল। অতএব, সর্ববজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন কেননা আমি চাই

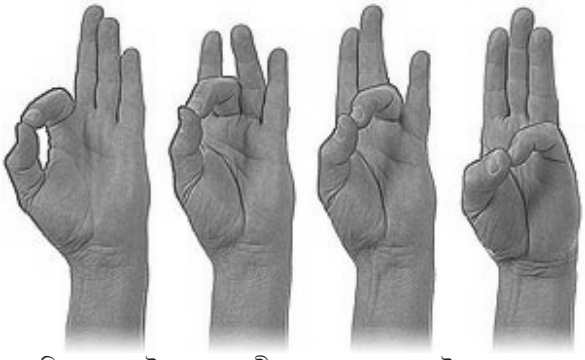

চিত্র ২. মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বুড়ো আঙুলকে এই ভাবে নাড়াতে পারে

না এই দেশে বাচ্চারা তাদের বুদ্ধির বিকাশ না হওয়ার কারণে শুধু কায়িক শ্রমের জন্য কাজে লাগুক। সেজন্য আজকে আপনাকে ভাবতে হবে।

আচ্ছা আপনার কাছে পয়সা আছে, আপনি আপনার বাচ্চাকে খেতেও দিচ্ছেন। পেটের খাবার আর মস্তিষ্কের খাবার কি একই? ভেবে দেখেছেন যে স্কুলে কিংবা স্কুলে যাবার আগের পর্যায়ে এই বাচ্চারা মস্তিষ্কের খাবার পাচ্ছে কি? আমাদর অভিজ্ঞতা বলছে যে, আজকে একটাও বাচ্চা তা ঠিকমতো পাচ্ছে না। এমনকী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে যেখানে বাবা-মা দুজনেই চাকরি করছেন, বাচ্চাটা কার কাছে থাকছে? বাড়ির কাজের মহিলার কাছে। তাঁরও তো আবার দুটো বাচ্চা আছে। বাচ্চাটা কিন্তু তার কোনো মনের খোরাক পেল না। আপনি বলবেন, ডা. সিং আপনি যে এই কথাগুলো বলছেন তার কি কোন প্রমাণ আছে? কলম্বিয়াতে আজ থেকে ২৩ বছর আগে একটা অদ্ভুত সমীক্ষা হয়েছিল। একটা বসতি, যেখানে শিশুদের অপুষ্টি ছিল, খাবার ছিল না, অনেক শিশু একসাথে ছিল। ইউনিসেফ-এর তরফ থেকে কিছু লোক ঠিক করল যে, সমস্ত বাচ্চাকে তারা ভালো খাবার দেবে। ভালো খাবার মানে প্রোটিন, ফ্যাট, মিনারেলস, কার্বোহাইড্রেট। কিন্তু যিনি গবেষক ছিলেন তিনি বললেন, না। এই পরীক্ষানিরীক্ষা কেবলমাত্র ৯ থেকে ১৫ মাস বয়েসের বাচ্চাদের নিয়ে করা হবে। এই বয়সি বাচ্চাদের কয়েকটা দলে ভাগ করা হল। একটা দলের বাচ্চাদের খুব ভালো খাবার দেওয়া হল, যা তাদের প্রয়োজন সেটাই দেওয়া হল। আরেকটা দলের বাচ্চাদের, যা বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে সেটাই দেওয়া হল, কোনো নতুন খাবার দেওয়া হল না। কিন্তু ঠিক করা হল একজন মানুষ সপ্তাহে একঘণ্টা সেই বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করবে, কিছু খেলনা দিয়ে যাবে। তৃতীয় দলের বাচ্চাদের দুটোই দেওয়া হল, আর চতুর্থ দলের বাচ্চাদের কিছুই দেওয়া দেওয়া হল না। আমি আবার বলছি, ৯ থেকে ১৫ মাস বয়েসের শিশুদের নিয়ে একদলকে ভালো খাবার দেওয়া হল আর একদলকে ভালো গল্প আর সাধারণ খাবার জিনিস দেওয়া হল, তৃতীয় দলকে দুটোই ভালো দেওয়া হল আর চতুর্থ দলকে কিছুই দেওয়া হল না। এক বছর পর দেখা গেল— প্রথম ও দ্বিতীয় দলের বাচ্চাদের বুদ্ধির বিকাশ বেশি হয়েছে, যাদের দুটোই দেওয়া হয়েছে (তৃতীয় দল) তাদের বুদ্ধির বিকাশ আরও বেশি হয়েছে, আর যাদের কিছুই দেওয়া হয়নি (চতুর্থ দল) তাদের তুলনায় বাকিরা এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু সেই বছরই টাকাটা বন্ধ হয়ে যায়। আর ভালো খাবার দেওয়া গেল না, গবেষকও টাকা পেলেন না। দ্বিতীয় বছর তিনি তাঁর সমীক্ষায় আবার গেলেন। দেখলেন যাদের ভালো খাবার দেওয়া হয়েছিল (প্রথম দল), যেহেতু খাবারটা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যাদের জন্য কিছুই করা হয়নি(চতুর্থ দল), আর কোনো পার্থক্য রইল না। তার মানে ওই দুই দলের বুদ্ধির বিকাশটা একই স্তরে রয়ে গেল। কিন্তু যাদেরকে খেলনা দেওয়া হয়েছিল, যাদেরকে গল্প শোনানো হয়েছিল, তারা বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে রইল। ২৩ বছর পরে আবার ওই বসতিতে যাওয়া হল। প্রত্যেকটা বাচ্চাকে ওঁরা খুঁজে বার করলেন। কী পেলেন? যাদের খেলনা দেওয়া হয়েছিল, গল্প শোনানো হয়েছিল, বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে তারা শুধু এগিয়ে যায়নি, তাদের ছেলেমেয়েরাও এগিয়ে গেছে। যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন তাঁদের হয়তো খাবার থাকত না, কিন্তু তাঁরা যেখানে থাকতেন একজন মানুষ সেখানে বাচ্চাদের নিয়ে বসে যেতেন পড়াতে বা গল্প বলার জন্য। এর ফলে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে দেখুন কোথায় এসে গেছে। একটা পুরোনো চীনা প্রবাদ আছে, "যদি আমাকে আজকে মাছ খেতে দাও তাহলে আমি আজকের জন্য বাঁচব। আর যদি তুমি আমাকে মাছ ধরতে শিখিয়ে দাও, তাহলে আমি সারা জীবনের জন্য বাঁচব।" আমি যখন সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বলছি আমি চাই, আসল জায়গাটা তাঁদের ধরিয়ে দিতে যাতে তাঁরা এই লড়াইতে শুধু আপনার সঙ্গে থাকবেন না, এই লড়াইটায় এগিয়ে গিয়ে তাঁরা নেতৃত্ব দেবেন। এটাই দরকার। তা নাহলে দ্রোণাচার্যের মতন একলব্যর বুড়ো আঙুল কাটতেই থাকবে, আর এর গল্প আমরা করতেই থাকব।

তিন বছর আগে পর্যন্ত আমি একজন সরকারি ডাক্তার ছিলাম। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতাম। সেই পৃথিবীটা আমার ছিল। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার একটা প্রকল্প শুরু করতে চাইল, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপরে ০ থেকে ৮ মাস বয়সের শিশুদের জন্য একটা কর্মসূচি বানাতে হবে। আমাকে ডাকা হল দিল্লিতে। সেই প্রকল্পটার নাম হচ্ছে 'রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম'। সেখানে আমরা বললাম যে, সমস্ত রকম চিকিৎসা যাতে একটা বাচ্চা পেতে পারে, এরকম একটা সমাজ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। এই কথাগুলো যখনই হয়, তখন সবাই কী বলেন জানেন তো? ভারতবর্ষ বড্ড গরিব দেশ। এখন এই গরিবিটা আমি বুঝি না। জ্ঞানের দারিদ্র্য নাকি

অর্থের দারিদ্র্য? দুটো কিন্তু এক জিনিস নয়। আজকে আপনারা এখানে সম্মিলিত হয়েছেন আর্থিক দারিদ্র্য মোচন করার জন্য নয়, অজ্ঞানতা দূর করার জন্য। এরজন্য প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির, যে দৃষ্টিভঙ্গি বলে টাকা নেই তা নয়, টাকা আছে। তাহলে কোথায় টাকা আছে? যখন বড়োদের স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়, শিক্ষার কথা বলা হয়, শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়, তখন বলা হয় ভারতবর্ষ একটা গরিব দেশ। কিন্তু ভারতবর্ষ আদৌ গরিব দেশ না। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের ফলে দেশটা গরিব হয়ে গেছে।

ধনী-দরিদ্রের চরম বৈষম্যের ছবিটা হল ভারতের শহরাঞ্চলের দুটো পাশাপাশি চরিত্র। প্রাসাদোপম সব বাড়ি আর তার পাশেই বস্তি। একদিকে একশ্রেণির মানুষ সমস্তরকম অর্থনৈতিক সম্পদের মালিক, আরেক শ্রেণির হাতে কোনো সম্পদ নেই। এই বৈষম্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি দুটো ভালো তথ্য পেয়েছি। আপনারা হয়তো জানেন যে, সারা পৃথিবীতে মাত্র ৬২ জনের (৫৩ জন পুরুষ এবং ৯ জন মহিলা) মিলিত সম্পদ পৃথিবীর ৩৬০ কোটি মানুষের সম্মিলিত সম্পদের সমান। আরও শুনবেন? বর্তমান পৃথিবীতে যাঁরা সবচেয়ে গরিব তাঁদের অর্থ কিন্তু কমে গেছে। কত কমে গেছে? ২০১০ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪০% কমে গেছে। আর একই সঙ্গে যাঁরা ধনী ছিলেন তাঁদের সম্পদ প্রায় ২ গুণের বেশি বেড়ে গেছে। তার মানে কি ধনীরা বেশি বুদ্ধিমান? তাঁরা কি কোনো তত্ত্ব পেয়ে গেছেন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মতো? তাঁরা কি কোনো নতুন যন্ত্র পেয়ে গেছেন যার জন্য তাঁদের অর্থনৈতিক সম্পদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ বাকিদের কমে যাচ্ছে? সেটা নয়। তাঁরা শিখেছেন একটাই জিনিস— 'যে সম্পদ তাদের কাছে আছে সেটা কী করে লুকিয়ে রাখতে হয়। কী করে কর ফাঁকি দিতে হয়।' এটাই হচ্ছে তার 'জ্ঞান'। এই 'জ্ঞান' কোনো নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্ম দেয় না, এই 'জ্ঞান' শেখায় কী করে পৃথিবীর সব মানুষকে প্রতারিত করা যায়। এই প্রতারণার মাধ্যমেই কর্পোরেটরা কর ফাঁকির স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলেছে এবং ২০০০ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সেই স্বর্গরাজ্যের কলেবর অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে টাকা নেই, বাচ্চার খাবারের জন্য টাকা নেই। যে মা আজ শিশুর জন্ম দিয়েছেন, তাকে আমি মাতৃত্বের কারণে ছুটি দিতে পারছি না। যে সময় বাচ্চার বুদ্ধিটা বাড়ছে তাকে আমি খাবার দিতে পারছি না। এর পাশাপাশি আমরা দেখছি এক শ্রেণির লোকেদের সম্পদ বেড়েই চলেছে।

এবার ১০% এর গল্প বলি। ইউরোপ ও আমেরিকার ১০% মানুষ, তারা ইউরোপ ও আমেরিকার সামগ্রিক আয়ের যথাক্রমে ৩০%-৩৫% এবং ৪৫-৫০% এর মালিক। ভারতবর্ষে কত ভাবতে পারেন? ৫০%-৬০%। এই ভারতবর্ষ, যাকে পৃথিবীর অন্যতম গরিব দেশ বলা হয়, যেখানে বলা হয় সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা নেই, সেই দেশে ১০% লোকের কাছে আছে দেশের সামগ্রিক আয়ের ৬০%। তা সত্ত্বেও আমাদের সরকার মনে করেন ওই ১০% লোক খুব অভাবে রয়েছে, তাঁদের আয় কী করে একটু বাড়ানো যায় তাই নিয়ে আমাদের সরকার চিন্তিত। আর আপনার আমার বাচ্চারা, পরবর্তী প্রজন্মের বাচ্চারা যদি বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে, যদি কায়িক শ্রম বেচে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সেটাই যদি তাদের জীবনে ভবিতব্য হয়, তাতে সরকারের কোনো অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় অর্থনৈতিক বৈষম্য সব থেকে কমে গিয়েছিল। ২০০০ সাল থেকে আবার এটা বাড়তে শুরু করেছে। আমাদের দেশেও বেড়েছে, আমেরিকাতেও বেড়েছে, সারা বিশ্ব জুড়ে বেড়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের সবচেয়ে নীচে থাকা ৫% মানুষের আয় কিন্তু বাড়েনি। এটা আমেরিকার মতো দেশে, যেটাকে আমরা উন্নত দেশ বলি সেখানকার ছবি। আমার খুব ভালো লাগল পরশু দিনের হিন্দু পত্রিকায় একটা খবর পড়ে, যার শিরোনাম ছিল- 'ধনীরা তাঁদের টাকার থলিটা আরও উপুড় করুক।' কেন ভারতে কর-বাবদ আদায় করা অর্থ জিডিপির মাত্র ১১%? যা কমপক্ষে জিডিপির ৫০% হওয়া উচিত। আমাদের দেশে যাঁরা বেশি সম্পদের মালিক, তাঁরা যথাযথ কর দেন না, শুধুমাত্র চাকুরিজীবীরা ঠিকঠাক কর দেন। এই ব্যবস্থাটা দেখে একজন ফরাসি অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে, কর ফাঁকি বন্ধ করতে না পারলে আমরা কোনোদিনই স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষার উন্নতির জন্য টাকার জোগান দিতে পারব না। উলটোদিকে, আমাদের সরকার চেষ্টা করছে ধনীরা যেটুকু কর দেন সেটা কী করে আরও কমানো যায়। ওই খবরে এটাও উল্লিখিত ছিল যে চীনও কিন্তু জানে যে কী করে রাজস্ব খাতে আয় বাড়াতে হয়, যাতে নাকি সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার জোগান নিশ্চিত করা যায়।

আজকাল একটা কথা খুব শোনা যায়, আপনার ছেলেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে না, সি.ই.ও. হতে হবে। আচ্ছা একটা বড়ো কোম্পানির সি.ই.ও.-র মাইনে কি শুধু কোম্পানির উৎপাদনশীলতা বাড়ার জন্য বাড়ছে? না। তাদের মাইনে বাড়ছে কেননা সি.ই.ও-রা জানে কী করে কোম্পানির কর বাঁচাতে হয়। এভাবেই ভারতে একশ্রেণির মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে আমরা বলতে পারি কি দেশটা গরিব? না। শুধুমাত্র সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করার কথা উঠলেই বলা হয় যে দেশটা তো গরিব। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে ২০০০ সাল থেকে ২০০৮-০৯ সালের মধ্যে দেশের জনসংখ্যার ১% মানুষের সম্পদ দুর্বার গতিতে বেড়েছে। আমাদের যেটা করতে হবে তা হল, কর ব্যবস্থায় সহজ আইন চালু করতে হবে। যাদের কাছে বেশি সম্পদ আছে তাঁদের কাছ থেকে আপনি, বাকিদের কাছ থেকে যেভাবে কর আদায় করছেন, অন্তত সেইটুকু আদায় করুন। আপনারা জানেন যে, বর্তমানে আমাদের দেশে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড-জনিত আয়ের ওপর কোনো কর দিতে হয় না। এই ডিভিডেন্ড-জনিত আয়ের ওপর যদি কর নেওয়া হত তবে সেই অঙ্কটা কিন্তু বিশাল হত। তাহলে কিন্তু সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করার জন্য আমাদের টাকার অভাব হত না। আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন যে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে সমাজের উঁচু তলার ১% লোকের আয় কীভাবে বেড়েছে। অতএব, টাকাটা রয়েছে। যদি আমেরিকাতে ধনী ব্যক্তিদের ওপরে উঁচু হারে কর আদায়ের নিয়ম হতে পারে তাহলে আমাদের দেশেও ধনীদের যেখানে এত আয়, আমরাও জিডিপি-র তুলনায় কর আদায়ের অনুপাত ১১% থেকে নিশ্চিত বাড়াতে পারি।

এখন কথা হচ্ছে টাকা থাকলেই কি স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে? দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের একটা সম্পর্ক আছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূচক যত বাড়ে, স্বাস্থ্যের সূচক তত খারাপ হয়। অর্থাৎ, যে সমাজে আয়ের বৈষম্য থাকবে সে সমাজে বেশি আত্মহত্যা হবে, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যা বেশি হবে, খাবারের অভাব হবে। এমনকী ইউরোপের দেশগুলোতেও দেখা গেছে যে শিশু-মৃত্যু হার বেড়ে যায় যখন কোনো দেশে আর্থিক অসাম্য বাড়ে। আর্থিক অসাম্য আমজনতাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার আগে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য-পরিসংখ্যানের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে আর্থিক বৈষম্য কিন্তু দারুণভাবে দেশের জনগণের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা যদি সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবি করি তবে একই সাথে আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও আমাদের সোচ্চার হতে হবে। কেননা, পৃথিবীর সর্বত্রই এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। যে দেশেই অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে সেখানেই স্বাস্থ্য পরিষেবার মান খারাপ হয়েছে। ভারতবর্ষে ১৯৯০ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে সাথেসাথে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়-বরাদ্দও কমেছে।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের কথা আপনারা সবাই শুনেছেন। আপনারা জানেন কি এইসব প্রতিষ্ঠানে কী পরিমাণে কালো টাকা তৈরি হয়? *টাইমস অফ ইন্ডিয়ার* একটা প্রতিবেদনে প্রকাশ যে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে প্রতি বছরে ৯৩০০ কোটি টাকার কালো টাকা তৈরি হয়। যদি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়তে হত তাহলে হয়তো আমি ডাক্তার হতে পারতাম না। প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি কেমন চলছে? একদিকে আমরা বলছি ডাক্তার বাড়াও, আরেকদিকে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের নামে কালো টাকার পাহাড় তৈরি হচ্ছে। সুইস ব্যাঙ্ক থেকে কালো টাকা দেশে ফেরানো নিয়ে সংসদে বিতর্ক হচ্ছে। সুইস ব্যাঙ্কে কালো টাকা জমছে, সাথে সাথে কালো টাকা তৈরি হচ্ছে এই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতেও। সুতরাং এগুলো সবই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঘটনা এবং আমরা যদি এদের কোনো একটা ব্যাপারে চুপ করে থেকে অন্য কোনো ব্যাপারে মুখর হই তবে কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হবে না। জাতীয় নমুনা পরীক্ষার (NSS) রিপোর্টে প্রকাশ যে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ অতীতের বছরগুলো থেকে কমে গেছে। বিগত বছরগুলোতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় হ্রাসের ফলে ৫৫ মিলিয়ন ভারতবাসীর জীবনের মান দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে নেমে গেছে। তাহলে একদিকে আমরা চেষ্টা করছি তাদের দারিদ্র্য সীমারেখার উপরে তুলতে, কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবে স্বাস্থ্য খাতে তাদের ব্যক্তিগত খরচ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে, তারা আবার দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে চলে যাচ্ছে। সমাজে এই ছবিটাই যদি বজায় থাকে তবে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আলোচনা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

আপনি যখন একটা বেসরকারি হাসপাতালে যান, সেই হাসপাতালের একটা লক্ষ্য থাকে। সেটা কী? সেটা হচ্ছে 'সর্বোচ্চ মুনাফা লোটা'। আর আপনার কী লক্ষ্য থাকে? আপনার লক্ষ্য থাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বোত্তম চিকিৎসা পাওয়া। কিন্তু দু-পক্ষের উদ্দেশ্যের মেলবন্ধন নাও ঘটতে পারে। আমি যদি কোনো হৃদ্‌রোগীকে বলি যে, যদি আপনি আপনার জীবনশৈলী পালটান তবে আগামী দিনে আপনার হৃদ্‌যন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যাগুলো অনেকটাই কমে যাবে কিংবা এখানে উপস্থিত ডা শ্রীনাথ রেড্ডির কথা অনুযায়ী আপনারা যদি কাঁচা লবণটা কম খান তাহলে রক্তের উচ্চচাপ-জনিত সমস্যাগুলো কমে যাবে—এই ধরনের পরামর্শ কি আপনি কর্পোরেট হাসপাতালগুলোর কাছ থেকে পাবেন? তাঁরা বরং আপনাকে কিছু ওষুধ গছানোর চেষ্টা করবে। মধুমেহ (Diabetes), রক্তের উচ্চচাপ (Hypertension)—এই সমস্যাগুলো কেমন করে সহজ সরল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দূর করা যায় সে পরামর্শ আপনি এইসব বেসরকারি হাসপাতালদের কাছ থেকে পাবেন না। এইজন্য আমার বিশ্বাস যে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না, যদি আমরা সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপারে এখন থেকেই সরব না হই। আমি অবাক হয়ে যাই যখন দেখি যে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ ক্রমশ কমে যাচ্ছে, রাজ্য সরকারগুলোকে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়াতে হচ্ছে আর চিকিৎসার জন্য দেশের মানুষদের আগের চেয়ে বেশি খরচা করতে হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য যে প্রকল্পটি (CGHS) আছে সেখানে বছরে কর্মী পিছু সরকারের বাৎসরিক ব্যয় ৬৬৮১ টাকা এবং মাত্র ৩২ লাখ কেন্দ্রীয় কর্মচারী এই প্রকল্পে উপকৃত হন। অপর পক্ষে, রাষ্ট্রীয় বিমা যোজনায় (RSBY) মাথা-পিছু খরচা হয় মাত্র ৭১ টাকা এবং এই প্রকল্পে ৮৪৪ লাখ মানুষ উপকৃত হন। সুতরাং মাথাপিছু ৬৬৮১ টাকা আর ৭১ টাকা খরচের পার্থক্যটা দেখতে পারছেন। কিন্তু সরকার RSBY-র বাজেট বরাদ্দ ২০১২-১৩ অর্থবর্ষ থেকে অর্ধেক করে দিয়েছে। এই প্রকল্পটি কার্যকরী হওয়া সত্ত্বেও সরকার প্রকল্পটিতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। অথচ, এই ধরনের প্রকল্পের ওপরই সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার সাফল্য নির্ভর করে। সেই সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, সেই সরকারি হাসপাতাল, সেই কাঠামোটাকে ব্যবহার করেই RSBY প্রকল্পটি চলে। এটা কিন্তু কোনো সমান্তরাল কর্মসূচি নয়। গুরুতর অসুস্থ রুগীদের AIIMS-এ পাঠানো হয়। AIIMS কিন্তু সরকারি হাসপাতাল। সুতরাং এই বিমা কোম্পানিগুলো কিন্তু অন্য কিছু করছে না, তারা সরকারের এবং সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোটাকেই কাজে লাগাচ্ছে। অথচ আমরা এই রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (RSBY) খাতে আর টাকা দিতে চাইছি না। এই RSBY নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। আমি একটা প্রবন্ধে দেখলাম যে এই RSBY নিয়েও অনেক গুরুতর সমস্যা আছে। সেইজন্য আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে প্রথমেই এই বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে যে, এই উন্নয়ন বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য বিমার হাত ধরে সম্ভব। এর মানে এই নয় যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, সুশাসনের মাধ্যমে আরও প্রশিক্ষিত করতে হবে এবং

সেটা করবার সময় কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলোকে অবহেলা করলে চলবে না। বর্তমানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। সরকার হচ্ছে একটা সি.ই.ও., তার কোম্পানি হচ্ছে সরকারি হাসপাতাল। কিন্তু সরকার তার নিজের হাসপাতালগুলোকে উন্নত করতে চায় না। বরং তারা বেসরকারি ক্ষেত্রকেই উন্নত করতে উৎসাহী। সরকার হচ্ছে এমন এক সি.ই.ও. যে নাকি নিজের প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিতে চায়।

আমি আবার বলতে চাই যে, স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প রূপায়ণের মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চিত করতে পারব যে আমাদের দেশের শিশুরা গণ্ডারের মতো ক্ষুদ্র ওজনের মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মাবে না। ৪ বছর বয়সে একটা গণ্ডারের ওজন দাঁড়ায় ১ টন কিন্তু তার মস্তিষ্কের ওজন হয় ৩৫০ গ্রাম। আমরা এমন এক ভারতবর্ষ চাই যেখানে একটি নবজাতক শিশুর ওজন হবে ২.৫ কেজি বা তার কম, কিন্তু তার মস্তিষ্কের ওজন হবে ৪০০ গ্রাম। কেরালার লোকেদের সাথে কথা বলার সময় আমি বলি যে আপনাদের দৈহিক উচ্চতা হরিয়ানার অধিবাসীদের থেকে খারাপ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকার দৌলতে আপনাদের জীবনধারণের মান দেশের মধ্যে উন্নত। অতএব, সবসময় দৈহিক উচ্চতা নয়, জনজাতির বুদ্ধি বিকাশের মাত্রাই হচ্ছে স্বাস্থ্য উন্নতির সূচক। আজকের দিনে যেকোনো মননশীল চর্চা দাবি করে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার, যে পরিষেবা শুধু মাত্র বেঁচে থাকাকেই গুরুত্ব দেয় না, সম গুরুত্ব দেয় জীবনযাপনের মানকেও।

আমাদের মস্তিষ্কের তিনটে অংশ আছে, প্রথম অংশটা আমাদের খাবার খেতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় অংশটা আমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর তৃতীয় অংশ হল কর্টেক্স, যা নাকি আমাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কর্টেক্সই একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের পার্থক্যকে তুলে ধরে। আমরা যদি ভারতীয়দের উন্নতমানের কর্টেক্স চাই তবে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সরকারকে টাকা খরচ করতে হবে। কেননা, এই ধরনের পরিষেবা প্রদানে কোনো মুনাফা লোটার সুযোগ নেই। এই পরিষেবার মধ্য দিয়ে শিশুকে বাঁচানো যায় কিন্তু মুনাফা লোটা যায় না।

হেকম্যান নামে একজন নোবেল-জয়ী অর্থনীতিবিদ গবেষণা করে দেখিয়েছিলেন যে, যখন মানুষের মস্তিষ্কের আকারের বৃদ্ধি বন্ধ হয়, তখন বাড়ি এবং সরকার স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার জন্য টাকা খরচ করে আর যখন মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন এইসব খাতে ব্যয় কমে যায়। সুতরাং একজন শিম্পাঞ্জী আর একজন মানুষের মধ্যে পার্থক্য কী? মানুষের প্রথম ৫ বছরে বুদ্ধির পুরো বিকাশটা হচ্ছে, যার ফলে আমি বা আপনি এখানে বসার অধিকার পাচ্ছি। এটা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এখানেই সর্বজনীন স্বাস্থ্য প্রকল্পের সার্থকতা। কেননা একমাত্র এই প্রকল্পেই মানুষের বুদ্ধির বিকাশকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, মানুষকে পণ্য হিসেবে দেখা হয় না। তাই টিভি খুললে যখন আপনি শুনতে পান এটা খেলে বাচ্চার বুদ্ধির বিকাশ হয়, সেটা নিছক বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন। বুদ্ধির বিকাশের জন্য একজন মা লাগে, কথা লাগে, আর লাগে সর্বজনীন স্বাস্থ্য প্রকল্প।

ধরুন দু-জন বাচ্চা আছে। এদের একজন বাবা-মাকে পেয়েছে, আরেকজন অনাথ আশ্রমে থেকেছে। যে অনাথ আশ্রমে ছিল তার উচ্চতা অনেক বেশি ছিল কিন্তু তার বুদ্ধির বিকাশ অন্যজনের থেকে কম। এই বাচ্চাটার যার বুদ্ধির বিকাশ ঠিকমতো হল না, তাকে হয়তো কায়িক শ্রমের কাজের জন্য ব্যবহার করা হবে, কখনোই মানসিক শ্রমের কাজে লাগানো হবে না। সুতরাং, আমাদের দেশ যদি জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য অর্থ-বরাদ্দ ঠিকমতো না করে, আমরা বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ব। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষ হল বুদ্ধের দেশ, আর বুদ্ধ ছিলেন জ্ঞানের প্রতীক। অতীতে ভারতবর্ষ জানত বাচ্চার বুদ্ধির বিকাশ কেমন করে করাতে হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক মূল্য না থাকার কারণে সময়ের সাথে সাথে সেই জ্ঞানের চর্চা লোপ পেল এবং আজকের দিনে কোনো মেডিক্যাল কলেজগুলোতে এই ব্যাপারে কিছু পড়ানো হয় না। আপনারা কোনোদিন কি কোনো ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলেছেন—"আমার বাচ্চাকে কেমন করে বড়ো করব যাতে তার বুদ্ধির বিকাশটা ভালো হয়?" আপনারা যাননি। আপনারা গেছেন বাচ্চার সর্দি হয়েছে, কাশি হয়েছে—সেইজন্য। এসব প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিশ্চয় দরকার, কিন্তু শিশুর বুদ্ধির বিকাশের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর বুদ্ধির বিকাশের কথা ভাবার অর্থ হল আগামী দিনে উন্নত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ভাবনা। শিশু চিকিৎসার একজন অধ্যাপক হিসেবে আমি দেখেছি যে আমাদের দেশে শিশুদের হাঁটতে শেখার জন্য ওয়াকারের মতো যন্ত্র উপহার দেওয়া হয়। আপনারা জানেন কি ওয়াকার কিন্তু শিশুদের হাঁটা শুরু হওয়াকে বিলম্বিত করে? কানাডাতে শিশুদের হাঁটতে শেখার জন্য ওয়াকারের ব্যবহার নিষিদ্ধ। যামিনী রায়ের একটা পেন্টিং আছে, কী করে মা তার শিশুসন্তানের বুদ্ধির বিকাশ ঘটাচ্ছে। তাকে যখন গান করে শোনাচ্ছে, তার চোখের দৃষ্টি, তার কানে শোনা, তার গায়ের গন্ধ—এসব কিছুর সঙ্গে শিশুটি পরিচিত হচ্ছে। এইভাবেই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে। এবার যদি সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের কর্মসূচি রূপায়িত না হয়, বাচ্চার চোখের যদি সমস্যা থাকে, কানের যদি সমস্যা থাকে, তাহলে তো তার বোধশক্তির বিকাশ ঘটবে না। পরবর্তী সময়ে সে যতই পড়ুক, ওই বোধশক্তি সে আয়ত্ত করতে পারবে না।

গীতাঞ্জলি-র ইংরেজি অনুবাদ (Song Offering) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমি শেষ করছি- "the sleep that flits on baby's eyes does anyone know from where it comes? The smile that flickers on baby's lips when he sleeps does anyone know from where it was brought?"

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অরুণ সিং বিশিষ্ট শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং নবজাতকের যত্ন বিষয়ে সফল গবেষক।

অজানা জ্বর

ডা. অর্ক বৈরাগ্য

সকালে খবরের কাগজটা হাতে নিলেন, জানতে পারলেন 'অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু দুই শিশুসহ পাঁচ গ্রামবাসীর'। একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও জ্বর ও তার কারণ কীভাবে অজানা থাকতে পারে বিজ্ঞানী তথা ডাক্তারদের কাছে? ডাক্তার হিসেবে প্রশ্নটা আমার মনেও এসেছে। ডাক্তারি পড়ে আর রোগী দেখে যা জানতে আর শিখতে পেরেছি তার অনেকটাই সহজবোধ্য বাংলায় বলা যায়। এখানে সেটা করার চেষ্টা করছি।

জ্বর রোগ, নাকি রোগের লক্ষণ?

জ্বর কি একটা আলাদা রোগ, যেমন টিবি বা কলেরা এক-একটা আলাদা আলাদা রোগ? এ নিয়েই প্রথম কথা শুরু করা যাক, কারণ রোগীরা অনেক সময় বলেন, ডাক্তারবাবু, আগেও আমার এরকম জ্বর হয়েছিল। 'এরকম জ্বর' বলতে তাঁরা বোঝান এতটা তাপমাত্রা উঠেছিল, কিন্তু জ্বরের কারণ যে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল, সেটা তাঁদের আলাদা করে বলে দিতে হয়। একটু ইতিহাস ঘাঁটা যাক।

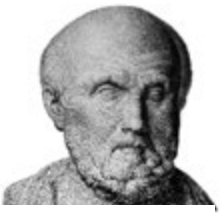

চিত্র ১. হিপোক্রেটিস

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিসের (খ্রি.পূ. ৪০০) লেখাপত্র থেকেই জ্বরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। সেই বিবরণ থেকে বোঝা যায় সেই সময়ে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডের মতো রোগের প্রাদুর্ভাবের কথাও। তারপর গ্যালেন (খ্রি. ২০০) এসে আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন 'জ্বর' নিজেই একটি রোগ। প্রায় পরবর্তী ১৫০০ বছর গ্যালেনের মতবাদই প্রচলিত থাকে চিকিৎসক মহলে। অষ্টাদশ শতকে বোয়েরহ্যাব 'জ্বর'এর যত্নসাধ্য মূল্যায়ন করেন এবং তাকে চরিত্রের বিচারে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে(১৮৬৬) ক্লিফোর্ড অ্যালবাট ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন। ১৮৭৬ সালে ফরাসি শারীরবিদ ক্লড বার্নার্ড আবিষ্কার করেন শারীরবৃত্তিয় বিপাকক্রিয়ায় দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং তার নিয়ন্ত্রণে স্নায়ুতন্ত্রের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। এর ১৩ বছর পর ১৮৮৮ সালে প্রফেশর ওয়েলশ একটি অসাধারণ গবেষণাপত্র লেখেন শরীরে তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ ও জ্বরের বিবর্তনগত ভূমিকা নিয়ে। তা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত টানেন যে 'জ্বর' কোনো রোগ নয়। মানবদেহে জ্বর আসলে অন্তর্নিহিত কোনো প্রদাহের লক্ষণ স্বরূপ এবং তা শরীরে আক্রমণকারী রোগজীবাণু ধ্বংস করে একটা উপকারী ভূমিকা পালন করে। বস্তুত সিফিলিস রোগের জীবাণু খুব তাপ-সংবেদী হওয়ায় সিফিলিস রোগে একসময় "জ্বর-চিকিৎসা" করা হত, যেখানে বাইরে থেকে রোগীর শরীরে জ্বরের জীবাণু (ম্যালেরিয়া) ঢুকিয়ে দেওয়া হত।

কাকে বলব অজানা জ্বর?

বিংশ শতাব্দীতে অ্যান্টিবায়োটিক, বিভিন্ন জটিল ও সূক্ষ্ম রক্ত ও অন্যান্য দেহ তরল পরীক্ষা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এম-আর-আই এত কিছুর আবিষ্কারের পর অধিকাংশ জ্বরের কারণ জানা গেছে ও তাদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা গেছে। কিন্তু সমান তালে মানুষেরও বিচরণ ক্ষেত্র বেড়েছে, এতদিনের অজানা রোগ জীবাণুর সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনাও বেড়েছে। গড় আয়ু বাড়ার সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে ক্যান্সার ও অটোইমিউন রোগের সংখ্যা। ফলে সমস্ত রকম জ্বর ও তার কারণ মেডিসিন বইয়ের শেষ পাতাতেও এখনও যাওয়া যাচ্ছে না। জীবাণুর সংক্রমণের জন্য হওয়া পরিচিত জ্বর ও তার কারণগুলোকে চিহ্নিত করা গেলেও সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছে অ-সংক্রামক রোগগুলো। এছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে পরিচিত জীবাণুগুলো সম্পূর্ণ অন্য চেহারায় হাজির হচ্ছে, ফলে দেরি হচ্ছে তার ডায়াগনোসিস-এ, অর্থাৎ জ্বরের কারণ নির্ণয়ে।

১৯৬১ সালে চিকিৎসকরা অজানা জ্বরের একটি সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেন। সেটি এইরকম:

১. জ্বরের মাত্রা ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি যা একাধিকবার পাওয়া যাচ্ছে

২. তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে জ্বর এবং

৩. এক সপ্তাহ ভর্তি রেখে অনুসন্ধান করার পরও কোনো রোগ নির্ণয় করা যায়নি।

সাম্প্রতিক কালে অজানা জ্বরের আরেকটু বিস্তৃত সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছে, সেখানে উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে বলা হয়েছে ক্লাসিক্যাল অজানা জ্বর। (ফিভার অফ আননোন অরিজিন—এফইউও)। নতুন সংযোজিত তিনটি শ্রেণিবিন্যাস হল: ১. হাসপাতাল ঘটিত এফইউও, ২. রক্তে নিউট্রোফিলের ঘাটতি জনিত এফইউও, ৩. এইচআইভি ঘটিত এফইউও। আলোচনার সুবিধার্থে আজ আমরা কেবল ক্ল্যাসিক্যাল এফইউও নিয়েই কথা বলব।

যে সমস্ত কারণে অজানা জ্বর হতে পারে

প্রথমে বলে নেওয়া যাক জ্বর সাধারণত কী কী কারণে হতে পারে।

১. সংক্রামক কারণ

এই কারণটিই অধিকাংশ সময় দেখা যায়। ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক ও পরজীবী প্রাণী—এই চারটি জীবাণু/প্রাণী শরীরের বিভিন্ন

দেহ তরল (রক্ত, মূত্র, মস্তিষ্কের রস অর্থাৎ সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, লসিকা)এর মধ্যে বংশ বিস্তার করতে পারে। এছাড়া ত্বক ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও এরা বাসা বাঁধতে পারে, যেমন লিভার, স্প্লিন, অন্ত্র, ফুসফুস ইত্যাদি।

ভাইরাস: হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, শ্বাসযন্ত্র আক্রমণকারী নানা জাতের ভাইরাস, চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গি, হেপাটাইটিস-এর নানা ধরন—এগুলো চেনা ভাইরাস, আর সাধারণত চট করে ধরা পড়ে। কিন্তু ক্রিমিয়ান কঙ্গো ভাইরাস, এইচআইভি ইত্যাদিকে ধরা সহজ নয়।

ব্যাকটিরিয়া: ফোঁড়া হলেও জ্বর হয়, তবে সেটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু ব্রুসেলা, লিস্টেরিয়া, টাইফয়েড, লেপ্টোস্পাইরা, মাইকোব্যাকটিরিয়া, ইয়েরসিনিয়া আরও অনেক ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে জ্বর হলে কারণ বোঝা শক্ত হতে পারে।

ছত্রাক: ছত্রাক থেকে হওয়া জ্বরে প্রায়শই কারণ বোঝা দুঃসাধ্য। অ্যাস্পারজিলা, ক্যান্ডিডা, ক্রিপ্টোকক্কাস, মিউকর ইত্যাদি ছত্রাক জ্বর ঘটাতে পারে।

পরজীবী: অ্যামিবা, ম্যালেরিয়া, টক্সোকারা, লিসম্যানিয়া। এদের কোনোটা আমাদের বেশি পরিচিত, কোনোটা আবার বেশ অপরিচিত।

২. কানেক্টিভ টিস্যু ডিসর্ডার

এই ধরনের রোগগুলি অনেক সময় জ্বর নিয়ে হাজির হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে কোনো জীবাণু সংক্রমণ হয় না। চট করে এদের ধরা শক্ত। উদাহরণ হিসেবে রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটস, এসএলই, সারকয়ডোসিস, স্টিলস ডিজ়িজের কথা বলা যেতে পারে। এই রোগগুলো হবার কারণটা বেশ অদ্ভুত। আমাদের শরীরের পাহারাদার কোষগুলোর কাজ হল আক্রমণকারী জীবাণু ধ্বংস করা। এই সব রোগে সেই পাহারাদার কোষগুলোই নিরীহ সাধারণ কোষগুলোর ক্ষতিসাধন করতে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এরকম রোগকে বলে অটোইমিউন রোগ। এই রোগগুলির সাথেই অনেক সময় অটোইমিউন রোগগুলোও মিলে মিশে থাকে। যে রোগে শরীরের পাহারাদার কোশগুলোই নিরীহ সাধারণ কোশগুলোর ক্ষতিসাধন করতে থাকে। যেমন হাসিমোতো থাইরয়েডাইটিস।

৩. ম্যালিগনেন্সি/ক্যান্সার

শুনতে অবাক লাগলেও বেশ কিছু ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক সময় কেবল জ্বর নিয়েই হাজির হয়, সেক্ষেত্রে রোগ নির্ধারণ করতেও কিছুটা সময় লেগে যায়। কোলোনের ক্যান্সার, পিত্তথলির ক্যান্সার, লিউকিমিয়া, প্যাংক্রিয়াসের ক্যান্সার, কিডনির ক্যান্সার, লিম্ফোমা ইত্যাদি ক্যান্সারে জ্বর হতে দেখা যায়।

৪. অন্যান্য কারণ

গাউট, কয়েকটি বংশগত বিপাকক্রিয়া সম্বন্ধীয় রোগ ইত্যাদিতে জ্বর হয়। জ্বর হতে পারে কিছু ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থেকেও, যেমন হার্টের রোগের ওষুধ কুইনিডিন, নার্ভের ওষুধ ফেনিটয়েন, এবং বিটা ল্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক।

হিসেব কষে দেখতে গেলে প্রায় দুশোর বেশি কারণ রয়েছে অজানা জ্বর হওয়ার। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রধানত সংক্রমণের জন্যেই বেশি অজানা জ্বর হয়। যেমন বিভিন্ন ভাইরাস, টিউবারকুলোসিস ইত্যাদি। অনেক সময় বুক ও পেটের মধ্যে 'অ্যাবসেস' (পুঁজ ভর্তি ঘা) থেকেও জ্বর হতে পারে। কিছু 'অন্ধকার' জায়গা রয়েছে শরীরের মধ্যে যেগুলোতে অ্যাবসেস হলে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন, ডায়াফ্রামের নীচে, লিভারের নীচে ও পিছনে, কিডনির পিছনে।

জ্বরের উপসর্গ ও লক্ষণ

জ্বরের কারণের উপর নির্ভর করে জ্বরের চরিত্র ও প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম

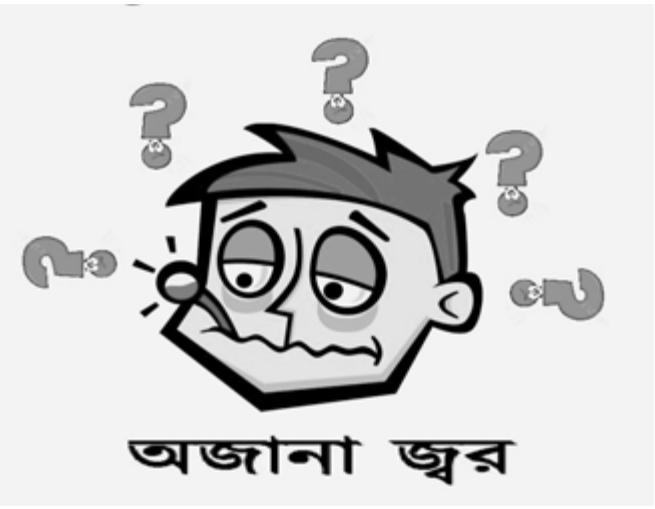

পার্থক্য থাকতে পারে, আর সেই পার্থক্য দেখেই চিকিৎসক শুরুর দিকে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। যেমন, শরীরের ভেতরে কোথাও লুকোনো 'অ্যাবসেস' থাকলে জ্বর আসার আগে খুব কাঁপুনি দেয় এবং শীত করে। ভাইরাস ঘটিত জ্বরে এই সম্ভাবনা ক্ষীণ। আবার কানেক্টিভ টিস্যু ডিসঅর্ডারে জ্বরের সাথে তীব্র গাঁটে ব্যথা, গাঁট ফোলা থাকতে পারে। সকালে বা রাতের দিকে এই উপসর্গ বাড়তে পারে। ভাইরাস ঘটিত জ্বরে গাঁটে ব্যথা থাকলেও রাত ও দিনের মধ্যে এই তফাত খুব একটা হয় না। কিছু ভাইরাল জ্বরে যখন লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন চোখ, প্রস্রাব হলুদ হতে অর্থাৎ জন্ডিস হতে পারে। কিছু ক্যান্সারে জ্বরের সাথে পায়খানার অভ্যাসের পরিবর্তন, দ্রুত শরীরের ওজন কমে যাওয়া, পেটের মধ্যে টিউমারের মতো ফোলা ভাব লক্ষ করা যেতে পারে।

অনেক সময় ভৌগোলিক অবস্থান, রোগীর বয়স, জ্বরের একটি এলাকা জুড়ে বিস্তারের প্রকৃতি থেকেও জ্বরের কারণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। সংক্রামক রোগগুলি একটি গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কিছু ভাইরাল জ্বরের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে কানেক্টিভ টিস্যু ডিসর্ডার ও ক্যান্সারের ক্ষেত্রে জ্বরটা শুধু ব্যক্তি রোগীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার, বয়স্ক

মানুষদের ক্যান্সার ও যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। দেখা গেছে জ্বর এর সময়কাল যত বেশি, সেটি সংক্রামক হওয়ার সম্ভাবনা তত কম, কিন্তু যক্ষ্মা ও এইচআইভি এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো করা দরকার

প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু প্রচলিত রক্ত পরীক্ষা করা হয়। যেমন: কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ইএসআর, ইলেক্ট্রোলাইটিস, সুগার, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন। তার সাথে বুকের এক্স রে, প্রস্রাবের ও পায়খানার পরীক্ষাও করা হয়। দেহ তরলগুলোতে জ্বরের জীবাণু থাকলে এই পরীক্ষাগুলোতে সাধারণত ধরা পড়ে যায়। তবে বেশির ভাগ অজানা জ্বরের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাগুলো যথেষ্ট হয় না, আরও কিছু পরীক্ষা করার দরকার পড়ে। যত্ন সহকারে রোগের ইতিহাস নিলে ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করে দেখলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তী বিশেষ পরীক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিশেষ পরীক্ষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: সিআরপি, লিভার ফাংশন টেস্ট, মাসল এনজাইম, ভিডিআরএল, এএনএ, স্কিন টেস্ট, সিরাম ফেরিটিন, ভিটামিন বি-টুয়েলভ ইত্যাদি। এছাড়াও রক্ত, মূত্র, থুতুর কালচারও করা হয়। এই সমস্ত পরীক্ষার শেষেও যদি কোনো 'ক্লু' না পাওয়া যায়, তবে বুকের-পেটের সিটি স্ক্যান করা ও কোলোনোস্কোপি করা বাঞ্ছনীয়। এমনকী এতেও কোনো ইঙ্গিত না পাওয়া গেলে নিউক্লিয়ার স্ক্যান ও পেট স্ক্যান করা প্রয়োজন। রোগ নির্ণয়ের পরবর্তী তথা শেষ ধাপে লিভার এবং অস্থিমজ্জা বায়োপ্সি করা হয়। একটা কথা এখানে বলা দরকার। অনেক পরীক্ষার নাম বললাম বটে, আর কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো দরকার হয় তাও ঠিক, কিন্তু আমাদের মতো দেশে এই ধরনের পরীক্ষা খুব খরচসাপেক্ষ, সব জায়গায় এগুলো করার ব্যবস্থাও থাকে না, আর অনেক রোগীই এত পরীক্ষা করাতে পারেন না। সে সব ক্ষেত্রে পরীক্ষা কিছু কম করেও পরের ধাপে যেতে হয়। পরীক্ষা করিয়ে যদি রোগ নির্ণয় সম্ভব হয় তবে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু সব কিছুর পরও কিছু না পাওয়া গেলে তখন দুটো রাস্তা খোলা থাকে। এক, অভিজ্ঞতা অনুসারে (এম্পিরিক্যাল) চিকিৎসা। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক, টিউবারকুলোসিসের ওষুধ, স্টেরয়েড দিতে হয়। দুই, সতর্ক, মনোযোগী প্রতীক্ষা, কারণ কিছু ক্ষেত্রে অনেক দিন পর জ্বর নিজে থেকেও সেরে যায়। কিন্তু তার কোনো ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হয় না।

চিকিৎসা

অজানা জ্বরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে জিনিসটা বেশি খেয়াল রাখা দরকার সেটা হল প্রথমেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া থেকে বিরত থাকা। প্রথমেই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলে পরে রক্ত বা প্রস্রাবের কালচার রিপোর্ট নেগেটিভ আসার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। একমাত্র যদি দেখা যায় রোগী অস্থিতিশীল আছে বা নিউট্রোফিল সংখ্যা খুব কম আছে, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। এম্পিরিক্যাল চিকিৎসা হিসেবে টিউবারকুলোসিসের ওষুধ দিলে তা ৬ সপ্তাহের জন্যে দেওয়া হয়, এর মধ্যে যদি রোগীর উন্নতি না হয় তবে অন্য রোগের কথা ভাবতে হবে। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর যদি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে জ্বরের কারণ সংক্রমণ নয়, তবেই চিকিৎসার শেষ ধাপে স্টেরয়েড দেওয়া উচিত, নতুবা রোগের প্রকোপ আগের থেকে আরও বেড়ে যেতে পারে। যদি ৬ মাস সতর্ক, মনোযোগী প্রতীক্ষার পরেও কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া যায় তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জ্বরের কারণ খুব গুরুতর নয়, না হলে ৬ মাসের মধ্যে রোগীর স্বাস্থ্যের ভয়াবহ অবনতি ঘটত। এই ক্ষেত্রে রোগীকে সহানুভূতিশীল আস্থা দেওয়া, ভরসা জোগানো জরুরি। শেষমেশ হাল ছেড়ে না দিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, নতুন করে আবার কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা। অজানা জ্বরের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা অনেকটা ক্রিমিনাল কেস সমাধান করার মতো। রোগীকে আশ্বাস ও ভরসা দেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসককে ওঁত পেতে বসে থাকতে হয়—রোগের কারণটি কখন পরবর্তী চালে নিজেকে প্রকাশ করার মতো কিছু করে ফেলবে, আর একটা জরুরি ক্লু হাতে পাওয়া যাবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে জ্বরের অস্তিত্ব অনেক পুরোনো। জ্বর যে কোনো দেবতার অভিশাপ নয়, বরং শরীরের চার ধাতের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার বহিঃপ্রকাশ—এই সিদ্ধান্ত করে হিপোক্রেটিস আজ থেকে ২৫০০ বছর আগে আমাদের সেই ক্ষমতা সেই অধিকার দিয়ে গেছেন যার বলে আমরা একটার পর একটা জ্বরের কারণকে চিহ্নিত করতে পেরেছি, তার চিকিৎসা করতে পেরেছি। জ্বর যে কোনো রোগ নয় বরং রোগের উপসর্গ তা-ই জানতে সময় লেগেছে গ্যালেন-পরবর্তী ১৫০০ টা বছর। ক্লিফোর্ড অ্যালবার্ট আমাদের জ্বর মাপতে শেখানোর আগে জানা ছিল না ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি জ্বর উঠলে তাকে অজানা জ্বর বলতে হয়। একবিংশ শতকে এসেও তাই আমরা আজও সবটা জেনে উঠতে পারিনি জ্বরের ব্যাপারে। তবে বিজ্ঞানে 'অজানা' কথাটা হতাশার নয়, উৎসাহের। যেটুকু জানতে পারছি না সেটাকেও আরও ভালোভাবে জানতে চাইলে বিজ্ঞানই একমাত্র হাতিয়ার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাত ধরে অজানা জ্বরকেও একদিন সম্পূর্ণ কাবু যেদিন আমরা করতে পারব, জ্বরের কারণ আর তার চিকিৎসার বইয়ের শেষ পাতাটা সেদিন আর ফাঁকা থাকবে না। তদ্দিন পর্যন্ত খোঁজ চলুক। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অর্ক বৈরাগ্য, এমবিবিএস, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে জেনারেল মেডিসিনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

কাশির সঙ্গে রক্ত

আগেকার দিনে বাংলা বা হিন্দি সিনেমায় কাশির সঙ্গে রক্ত পড়লে দর্শকরা বুঝে নিতেন কী হতে চলেছে—টিবি বা যক্ষ্মা, নায়ক বা নায়িকার কিছু চোখ-ভেজানো ডায়ালগ, তারপর দেহত্যাগ। গত শতকের সাতের দশকের শেষাশেষি চিত্রনাট্যের একটু বদল ঘটল। কাশির সঙ্গে রক্ত, ক্যান্সার, ডায়ালগ ও দেহত্যাগ। বাঙালি তথা ভারতীয় দর্শক আজ পর্যন্ত কাশি আর রক্তপড়া দেখলে এই ছকের বাইরে তেমন ভাবতে পারেন না। কিন্তু বাস্তব কি তাই বলে? গ্রেট ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থা কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া নিয়ে ইন্টারনেটে রোগী ও ডাক্তারদের জন্য তথ্য দিয়েছেন। তার ওপর ভিত্তি করে, আর ভারতে কিছু রোগ ব্রিটেনের চাইতে বেশি আর কিছু রোগ তুলনায় কম সেটা মাথায় রেখে, নীচের নিবন্ধটি **সম্পাদকমণ্ডলী** *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠকের সামনে রাখছেন।

কাশির সঙ্গে রক্ত কথাটা সাধারণ মানুষের বোঝার পক্ষে সুবিধাজনক বটে, কিন্তু আমরা এখানে যে বিষয়টা নিয়ে আজ আলোচনা করব তার টেকনিক্যাল পরিভাষার সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া যাক। কথাটা হল 'হিমোপ্টিসিস', বাংলা করলে দাঁড়ায় 'কফের সঙ্গে রক্ত'। আমরা এখন থেকে এই 'হিমোপ্টিসিস' শব্দটা ব্যবহার করব। কারণ কফের সঙ্গে রক্ত কাশির সঙ্গে হতে পারে, আবার কাশি ছাড়াও হতে পারে। অন্যদিকে কাশির সঙ্গে বেরোনো রক্ত মুখ-নাক ইত্যাদি থেকে আসতে পারে, যেমন অনেক সময় দাঁত বা মাড়ী থেকে রক্ত পড়ে মুখে জমে থাকলে তা কাশির সঙ্গে বেরোতে পারে।

'হিমোপ্টিসিস' কথাটা দিয়ে যা বোঝানো হয় তা হল—স্বরযন্ত্রের থেকে নীচে অবস্থিত শ্বাসযন্ত্রের কোনো অংশের রোগ বা ক্ষত থেকে রক্ত কফের সঙ্গে বেরোনো। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন যে কেবল কফের সঙ্গে রক্ত বেরোলেই তা 'হিমোপ্টিসিস' হয় না। রক্ত স্বরযন্ত্রের নীচ থেকে আসছে নাকি তার ওপর থেকে—সেটা বোঝার দরকার আছে, কেননা তার ওপর ভিত্তি করেই রোগ ধরা ও তার চিকিৎসা দুটোই পুরো আলাদা হয়ে যায়।

হিমোপ্টিসিস-কে অন্য দু-রকম রক্তপাতের থেকে আলাদা করে চিনতে হয়।

১. 'হিমাটেমেসিস', বা বাংলায় বললে রক্তবমি। এতে পেটের ভেতর (পাকস্থলি বা ক্ষুদ্রান্ত্র) থেকে রক্ত আসে।

২. 'সিউডো-হিমোপ্টিসিস', বাংলায় বললে 'ছদ্ম-হিমোপ্টিসিস'। যদি কফের সঙ্গে রক্ত আসে, কিন্তু সেই রক্ত স্বরযন্ত্রের নীচেকার শ্বাসযন্ত্র থেকে না আসে, তবে তাকে বলে 'সিউডো-হিমোপ্টিসিস'। মুখের ভেতরের রক্ত (যেমন মাড়ী থেকে আসা রক্ত) মুখের পেছনে জমা হতে পারে ও কফের সঙ্গে বেরোতে পারে; আবার নাক থেকে রক্ত পড়ে তা মুখবিবরের পেছনে জমা হয়ে তারপর কফের সঙ্গে বেরোতে পারে। এগুলো আসল হিমোপ্টিসিস নয়, এরা ছদ্ম বা সিউডো-হিমোপ্টিসিস। আবার পেট থেকে রক্তপাত হয়ে তা হিমাটেমেসিস (রক্তবমি)-র ফলে রোগীর শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়তে পারে ও সেই রক্তই পরে ছদ্ম-হিমোপ্টিসিস হয়ে বেরোতে পারে।

হিমোপ্টিসিস কখন গুরুতর?

কতটা রক্ত বেরোলে তবে তা বেশি চিন্তার কারণ? ১০০ মিলিলিটার থেকে ১০০০ মিলিলিটার পর্যন্ত বেরোলেই তাকে গুরুতর বলা যায়। তার সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ঠিক কতটা রক্ত বেরোল সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই রক্তপাতের ফলে রোগীর বিপদ কতটা হল। একজন রুগ্ন, অসুস্থ, দুর্বল মানুষ যে রক্তপাতে বিপদের পড়বেন, আরেকজন সুস্থ সবল মানুষ সেটা অনায়াসেই সহ্য করবেন। তাই কতটা রক্ত বেরোল, আর রোগীর সাধারণ শারীরিক অবস্থা কেমন—এই দুটো মিলিয়েই হিমোপ্টিসিস-এর গুরুত্ব বিচার করতে হবে।

হিমোপ্টিসিস-এর কারণ

কোন প্রত্যঙ্গ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে সেটা বিচার করে হিমোপ্টিসিস-এর কারণগুলো ভালো করে বোঝা যায়। সেটা বুঝতে গেলে মানুষের শ্বাসযন্ত্রের গঠন একটু জানা দরকার। স্বরযন্ত্রের নীচে শুরু হচ্ছে ট্রাকিয়া

নামক শ্বাসনালী, সেটা বুকের ভেতর দিয়ে শ্বাসবায়ু নীচে নিয়ে যায়। বুকের মাঝামাঝি নেমে ট্রাকিয়া দু-দিকে 'ব্রঙ্কাস' নামে শ্বাসনালীতে ভাগ হয়ে দুটো ফুসফুসে ঢোকে—ঢোকার মুখে ও ঢোকার পরে ব্রঙ্কাসগুলো আবার বহু-বিভক্ত হতে থাকে, ঠিক যেন গাছের শাখা-প্রশাখা। ডাক্তারি পরিভাষায় এদের ব্রঙ্কিওল বলে। এরা শ্বাসবায়ুকে ফুসফুসের মধ্যে পৌঁছে দেয়।

ট্রাকিয়া বা ব্রঙ্কাস (শ্বাসনালী) থেকে যেসব কারণে রক্ত বেরিয়ে হিমোপ্টিসিস হতে পারে সেগুলো হল—

➢ **ব্রঙ্কাইটিস**—এ হল ব্রঙ্কাস-এর প্রদাহ। নামটা আমাদের অনেকটা পরিচিত। সাধারণত সংক্রমণ থেকে শুরু হয়; শ্বাসকষ্ট অন্যতম লক্ষণ।

➢ **ব্রঙ্কিয়েকটেসিস**—এতে ব্রঙ্কাস-এর রোগগ্রস্ত অংশগুলো মোটা হয়ে যায়। ফুসফুসের পুরোনো বা দীর্ঘমেয়াদি রোগ থাকলে শ্বাস-চলাচলে বহুদিন বাধা পড়ে ও ব্রঙ্কাস চওড়া হয়ে শ্বাসবায়ুর পথ করে দেয়। কিন্তু এতে ব্রঙ্কাস-এর গঠন স্বাভাবিক থাকে না, ও পরে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়—হিমোপ্টিসিস তাদের অন্যতম।

➢ **শ্বাসনালীর** কোনো জায়গায় চোটের ফলে রক্তপাত।

➢ **শ্বাসনালীর** কোনো জায়গায় কোনো বাইরের জিনিস আটকে থাকার ফলে রক্তপাত, যেমন বাচ্চারা পয়সা বা খেলনা খেয়ে ফেললে সেটা শ্বাসনালীর কোথাও আটকে গিয়ে সেখান থেকে রক্ত বেরোতে পারে।

➢ **ফুসফুসের নানারকম ক্যান্সার**—আমাদের পরিচিত ফুসফুসের যে ক্যান্সারের ডাক্তারি নাম 'ব্রঙ্কোজেনিক কারসিনোমা', সেটা এর মধ্যে প্রধান।

ফুসফুসের অন্য কোষকলা (Lung parenchyma) থেকে যেসব কারণে রক্তপাত ও তার ফলে হিমোপ্টিসিস হতে পারে সেগুলোর মধ্যে প্রধান হল—

➢ **ফুসফুসে 'অ্যাবসেস'**—বাংলায় একে ফুসফুসে ফোঁড়া বলতে পারি।

➢ **নিউমোনিয়া**—এ নামটা আমাদের চেনা; এটা হল ফুসফুস-জুড়ে বা ফুসফুসের একটা বড়ো অংশ জুড়ে সংক্রমণ।

➢ **টিবি বা যক্ষ্মা**—এর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য।

➢ **ছত্রাক সংক্রমণ**—এটা চামড়ায় হলে চেনা সহজ, কিন্তু ফুসফুসে হলে চেনা শক্ত। বিশেষ করে টিবি বা ওইরকম কোনো কারণে ফুসফুসে গহ্বর তৈরি হলে বা ব্রঙ্কিয়েকটেসিস থাকলে, কিছু ধরনের ছত্রাক সহজে আক্রমণ করে।

➢ কোনো চোটের ফলে ফুসফুস জখম হলে সেখান থেকে হিমোপ্টিসিস হতে পারে।

এছাড়া কম দেখা যায় এমন কিছু রোগ থেকে হিমোপ্টিসিস হয়; তাদের মধ্যে আছে ফুসফুসের হাইডাটিড সিস্ট, গুডপাসচুরের রোগ সংলক্ষণ, ফুসফুসের হিমোসিডারোসিস, ওয়েগনারের গ্রানুলোম্যাটোসিস, বেহসেটস ডিজ়িজ ও লুপাস নিউমোনাইটিস। এই নামগুলো লিখবার উদ্দেশ্য এটা বোঝানো যে কোনো কোনো সময় হিমোপ্টিসিসের পিছনের রোগটি ধরতে দেরি হতে পারে, অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হতে পারে, কিন্তু সেটা সাধারণত এরকম অ-সাধারণ রোগের ক্ষেত্রেই কেবল হয়।

ফুসফুসের মধ্যেকার রক্তনালীর রোগ (Vascular) যা থেকে হিমোপ্টিসিস হতে পারে সেগুলো হল—

➢ **মাইট্রাল স্টেনোসিস**—এতে হৃদ্‌যন্ত্রের একটা কপাটিকার মুখ ছোটো হয়ে যায়। এতে ফুসফুসীয় ধমনিতে রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে হিমোপ্টিসিস হতে পারে। আমাদের দেশে ছোটোবেলায় রিউম্যাটিক জ্বর খুব দেখা যায়, তার ফলে এটা হতে পারে; অবশ্য এটা জন্মগত ত্রুটির জন্যও হতে পারে।

➢ **ফুসফুসীয় শিরার রক্তচাপ বৃদ্ধি**—নানা কারণে এটা হতে পারে। যেমন বহুদিনকার উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের বাম নিলয়ের স্ফীতির ফলে বাম নিলয়ের কার্যক্ষমতা কমে যায়, ফলে ফুসফুসীয় শিরার রক্তচাপ বাড়ে।

➢ **অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম**—আমাদের বুকের মধ্যে থাকা মহাধমনির দেয়াল দুর্বল হয়ে ফুলে ওঠে।

➢ **পালমোনারি এমবলিজম**—শরীরে কোথাও শিরার মধ্যে রক্ত জমে গিয়ে একটা ডেলার মতো হয়ে তা রক্তপ্রবাহের সঙ্গে মিশে ফুসফুসীয় ধমনিতে চলে আসতে পারে, ও তার কোনো শাখা-প্রশাখাকে বন্ধ করে দিতে পারে। একেই বলে পালমোনারি এমবলিজম। শরীরে কিছু রোগ থাকলে এর সম্ভাবনা বেশি। সাধারণত অনেকক্ষণ নাড়াচড়া না করে বসে থাকলে (যেমনটা লম্বা এরোপ্লেন সফরে হয়) পায়ের শিরায় রক্ত জমে গিয়ে এমন বিপত্তি ঘটাতে পারে।

➢ চোটের ফলে **ফুসফুসের শিরা জখম** হলে হিমোপ্টিসিস হতে পারে।

➢ নানা ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসার সময় (যেমন বুকের 'ড্রেন' ঠিকভাবে না বসানো, ফুসফুসীয় মহাধমনির মধ্যে ক্যাথেটার বসানোর সময় চোট লাগা) হিমোপ্টিসিস হতে পারে।

অন্যান্য কারণ

➢ রক্ত ঠিকমতো জমাট না-বাঁধার রোগ—যেমন অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, অস্থিমজ্জার ক্যান্সার, কয়েকপ্রকারের লিউকেমিয়া ইত্যাদি।

➢ ওষুধের জন্য রক্ত ঠিকমতো জমাট না-বাঁধা—যে সমস্ত রোগী হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ বা ওইরকম কোনো রোগ আটকানোর জন্য অ্যাসপিরিন, ওয়ারফেরিন ইত্যাদি ওষুধ নিচ্ছেন, তাঁদের যেকোনো জায়গায় রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না, ফলে হিমোপ্টিসিস-এর সম্ভাবনা কিছু বেশি।

➢ 'বানানো' হিমোপ্টিসিস: এ হল হিমোপ্টিসিস-এর ভান। সেটা কিন্তু সবসময় রোগী ইচ্ছে করে করছেন তা নাও হতে পারে। কফি খাবার পর কাশবার সময় যে লালচে কফ বেরোয়, সেটা দেখে হয়তো তাঁর মনে হতে পারে যে তাঁর হিমোপ্টিসিস হচ্ছে। আবার এর পেছনে কোনো মানসিক রোগও থাকতে পারে।

মনে রাখা দরকার উন্নততম চিকিৎসাব্যবস্থাতেও শতকরা ১৫-২০ ভাগ হিমোপ্টিসিস-এর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাচ্চাদের হিমোপ্টিসিস বেশি দেখা যায় না, কিন্তু ভাবার বিষয় হল অনেকটা রক্তপাত না হলে এদের হিমোপ্টিসিস বোঝা সম্ভব নয়। বাচ্চারা কাশির সঙ্গে কফ তোলে কম, তাদের প্রবণতা হল কফ গিলে ফেলা। ফলে অল্পস্বল্প হিমোপ্টিসিস-এর রক্ত বাচ্চা গিলে ফেলে, ও তা হিমাটেমেসিস (বমির সঙ্গে কালচে রক্ত) বা ম্যালিনা (পায়খানার সঙ্গে কালচে রক্ত) হিসেবে বেরোয়। বাচ্চাদের হিমোপ্টিসিস-এর সাধারণ কারণ হল শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ আর শ্বাসনালীর কোথাও বাইরের জিনিস (পয়সা ইত্যাদি) আটকে থাকা। এছাড়া জন্মগত হৃদ্‌রোগ হিমোপ্টিসিস-এর কারণ হতে পারে।

হিমোপ্টিসিস ব্যাপারটা কতটা সহজপ্রাপ্য?

এদেশে অনেক রোগী হিমোপ্টিসিস নিয়ে ডাক্তার দেখাতে আসেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন বেশি রক্তপাত হয় না, আর নিজে থেকেই সেরে যায়, কেননা কোনো সংক্রমণ থেকেই এটা হয়, আর ওষুধ দিয়ে বা না দিয়ে সেই সংক্রমণ কমে যায়। কিন্তু একবার হিমোপ্টিসিস হলে সেই রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ এর পেছনে গুরুতর রোগ থাকতেও পারে। আমাদের দেশে টিবি রোগ বেশি হয়, এছাড়া শ্বাসযন্ত্রের ওপর দিকে সংক্রমণ (যথা ব্রঙ্কাইটিস) ও নীচের দিকে সংক্রমণ (যেমন নিউমোনিয়া) হতে পারে। আর ক্যান্সার যদিও তুলনায় কম মানুষের হিমোপ্টিসিস-এর কারণ, কিন্তু ক্যান্সারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার দরকার হতে পারে অনেক ক্ষেত্রেই।

কীভাবে বোঝা যাবে কোথা থেকে রক্ত আসছে?

প্রথমে হিমাটেমেসিস বা রক্তবমির সঙ্গে হিমোপ্টিসিস-এর তফাত বোঝার চেষ্টা করা যাক।

হিমোপ্টিসিস	হিমাটেমেসিস
বমি বা বমিভাব থাকে না	বমি বা বমিভাব থাকে।
ফুসফুস বা শ্বাসযন্ত্রের কোথাও সমস্যা থাকে।	পরিপাকতন্ত্রের কোথাও বা লিভারে সমস্যা থাকে।
রক্তের সঙ্গে ফেনা থাকে।	রক্তের সঙ্গে ফেনা থাকে না।
কফে রক্ত থাকে তরল বা জমাট অবস্থায়।	কফির মতো কালচে জিনিস বেরোয় (বমির সঙ্গে)।
রক্তের রং উজ্জ্বল লাল বা গোলাপি।	কালচে রক্ত।
যেটা বেরোয় সেটা ক্ষারীয় পদার্থ।	যেটা বেরোয় সেটা অম্লধর্মী (অ্যাসিড)।
অণুবীক্ষণে দেখলে শ্বেতরক্তকণিকা পাওয়া যাবে।	অণুবীক্ষণে দেখলে খাদ্যবস্তু পাওয়াযাবে।

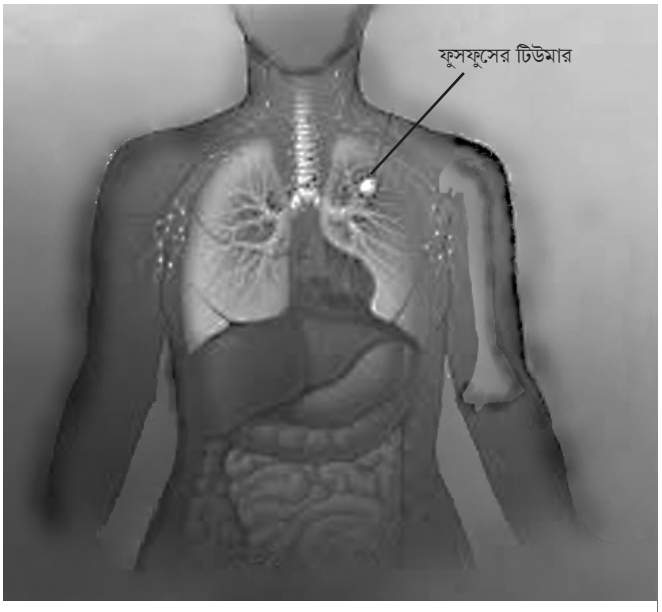

চিত্র ১. ফুসফুসের টিউমার

উপসর্গ

➢ আচমকা কাশি, জ্বর, রক্ত ও পুঁজমিশ্রিত কফ—প্রবল নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসে এমন দেখা যায়।

➢ মেয়াদি কাশি ও তাতে কফ ওঠা—এটা ব্রঙ্কাইটিস আর ব্রঙ্কিয়েকটেসিস-এর লক্ষণ হতে পারে।

➢ জ্বর, রাতে ঘাম দেওয়া, ওজন কমা—টিবি ও ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। সঙ্গে অখিদে থাকলে ব্রঙ্কোজেনিক কারসিনোমার সম্ভাবনা বেশি, বিশেষ করে যদি কাশির ধরন বদলায়।

➢ শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি, বসে থাকলেও শ্বাসকষ্ট, রাতে আচমকা শ্বাসকষ্টে ঘুম ভেঙে যাওয়া আর ফেনা সমেত গোলাপি হিমোপ্টিসিস—ক্রনিক হার্ট ফেলিয়োর বা বাম নিলয়ের কার্যক্ষমতা কমে যাবার ফলে ফুসফুসীয় শিরার রক্তচাপ বাড়া থেকে হতে পারে।

➢ আচমকা শ্বাসকষ্ট আর ফুসফুসের পর্দা থেকে বুকে ব্যথা—খুব সম্ভবত পালমোনারি এমবলিজম। তবে কোনটা ফুসফুসের পর্দা থেকে বুকে ব্যথা (pleuritic chest pain), সেটা বুঝবার জন্য ডাক্তারের সযত্ন পরীক্ষা অবশ্যই দরকার।

লক্ষণ ও রোগ নির্ণয়

জ্বর, নাড়ির দ্রুত গতি, দ্রুত শ্বাস, ওজন কমা—এগুলো আছে কিনা ও কতটা আছে সেটা দেখা দরকার। এছাড়া রক্তাল্পতাজনিত ফ্যাকাশে ভাব, রক্তে অক্সিজেন কমে যাবার জন্য (ফর্সা লোকেদের) গায়ের রং নীলাভ হয়ে যাওয়া, চামড়ার তলায় রক্তপাত, লসিকাগ্রন্থি বড়ো হয়ে যাওয়া, চামড়ার তলার রক্তজালিকা মোটা হয়ে যাবার ফলে দৃশ্যমান হওয়া—এসবও দেখা উচিত। হাসপাতালে ভর্তি থাকলে রক্তে অক্সিজেন কমে গেছে কিনা সেটাও দেখা হয়।

নাসিকা গহ্বর পরীক্ষা করে দেখা উচিত, আর রোগীকে হাঁ করিয়ে মুখের ভেতরটা আর মুখবিবরের পেছনের দেয়াল (oropharynx) দেখা উচিত। এখানে রক্তপাতের কারণ খুঁজে পাওয়া গেলে তা হল 'সিউডো-হিমোপ্টিসিস', বা 'ছদ্ম-হিমোপ্টিসিস'। হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করে মাইট্রাল স্টেনোসিস ও হার্ট ফেলিয়োর বোঝা যায়; এমবলিজম হয়েছে কিনা তারও আভাস পাওয়া যায়।

স্টেথোস্কোপ দিয়ে ফুসফুস পরীক্ষা করে সেখানে রক্তপাত হয়েছে কিনা তার আভাস পাওয়া যায়। এভাবে ফুসফুসে সংক্রমণ, শ্বাসক্রিয়ায় বাধার উপস্থিতি, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস, শ্বাসযন্ত্রে বাইরের বস্তুর (যেমন পয়সা বা খেলনা) উপস্থিতি, টিবি ও টিউমার-এর উপস্থিতিও আঁচ করা যায়।

এছাড়াও দেহের নানা অংশ পরীক্ষা করে (যেমন আঙুলের নখের আকৃতি পরিবর্তন বা Digital clubbing), নানা স্থানের লসিকাগ্রন্থির বৃদ্ধি এসব দেখে হিমোপ্টিসিস-এর কারণ অনেক সময়েই ধরা যায়। ভালোভাবে রোগী পরীক্ষা করার পরে উপযুক্ত ল্যাবরেটরি পরীক্ষার দরকার হতে পারে। ঠিকভাবে রোগী না দেখে 'সিটি স্ক্যান' লিখে দায় সারলে রোগ ধরা শক্ত।

ল্যাবোরেটরি পরীক্ষা

দু-ধরনের পরীক্ষা প্রায়ই দরকার হয়—এক হল নানাভাবে ফুসফুস আর তার পাশের দেহযন্ত্রের ছবি তোলা, দুই হল ব্রঙ্কোস্কোপি। এছাড়া ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, ও নানারকম রক্ত পরীক্ষা ও কফ পরীক্ষা করতে হতে পারে।

ছবি তোলার মধ্যে প্রথম হল বুকের এক্স-রে। হিমোপ্টিসিস রোগীদের শতকরা ৩০ ভাগের এক্স-রে করে কিছু ধরা যায় না। তখন ভাবতে হয় অন্য পরীক্ষার কথা। বুকের সিটি-স্ক্যান করলে আরও অনেক বেশি ক্ষেত্রে হিমোপ্টিসিস-এর কারণ বোঝা যায়। সেখানেও কারণ পরিষ্কারভাবে ধরা না পড়লে অন্য জটিলতর পরীক্ষা করতে হয়, সেগুলো নিয়ে বেশি কথার অবকাশ এখানে নেই।

এই সব ছবি তোলার পাশাপাশি দরকারমতো ব্রঙ্কোস্কোপি করতে হবে। আধুনিক ফাইবারঅপ্টিক ব্রঙ্কোস্কোপ নামক মাথায় ক্যামেরা বসানো নল ফুসফুসে পাঠিয়ে সরাসরি দেখা যায়। যদি বুকের এক্স-রে ছবিতে কোনো টিউমার দেখা যায় বা এক্স-রে স্বাভাবিক হলেও অন্য কারণে ক্যান্সার সন্দেহ করা হয় সেখানে এই নল ঢুকিয়ে টিউমার থেকে কোষ নিয়ে তার পরীক্ষা (বায়োপ্সি) করা জরুরি। আর যেখানে বুকের সিটি-স্ক্যান করেও হিমোপ্টিসিস-এর কারণ ধরা যাচ্ছে না সেখানেও এইভাবে বায়োপ্সি করতে হবে।

আবার, যদি হৃদযন্ত্রের অসুখ বা পালমোনারি এমবলিজম সন্দেহ করা হয় তাহলে ইসিজি আর ইকোকার্ডিওগ্রাম করতে হবে। টিবি সন্দেহ হলে কফের (থুতু-র নয়) পরীক্ষা করে টিবি-র জীবাণু আছে কিনা দেখা দরকার। এছাড়া রক্তের সাধারণ পরীক্ষা, রক্ত জমাট বাঁধার পরীক্ষা, রক্তের অক্সিজেন ও কার্বননডাই অক্সাইড-এর পরিমাণ মাপা, প্রস্রাব পরীক্ষা, এমনকী এইডস-এর সংক্রমণ ঘটেছে কিনা সেটা দেখার পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে। দরকার হতে পারে ঠিকই, কিন্তু সব পরীক্ষা সবার জন্য নয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্প পরীক্ষায় কাজ চলে।

চিকিৎসা

হিমোপ্টিসিস-এর চিকিৎসা তার কারণ অনুসারে হয়। কোথা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে সেটা আগে বোঝা দরকার। তারপর কেন বা কোন রোগ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে সেটা বুঝে তার সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা করা যায়।

সামান্য হিমোপ্টিসিস-এর চিকিৎসা

এক্স-রে যেখানে স্বাভাবিক, আর রোগের ইতিহাস শুনে মনে হচ্ছে ব্রঙ্কাস-এর সংক্রমণ—তখন মুখে খাবার অ্যান্টিবায়োটিক চালু করা আর ধূমপান বন্ধ করা প্রাথমিক কাজ। রক্তপাত বন্ধ হবার কয়েক সপ্তাহ পরে আবার রোগীকে দেখা দরকার।

এসব ক্ষেত্রে কখন সিটি-স্ক্যান এবং/অথবা ব্রঙ্কোস্কোপি করতে হবে?

- ❖ যদি দু-সপ্তাহের বেশি হিমোপ্টিসিস থাকে;
- ❖ বারবার হিমোপ্টিসিস হতে থাকে,
- ❖ একবার হিমোপ্টিসিস-এ ৩০ মিলিলিটারের চাইতে বেশি রক্ত বেরোয়,
- ❖ রোগী চল্লিশোর্ধ্ব ধূমপায়ী হন;
- ❖ ব্রঙ্কিয়েকটেসিস সন্দেহ করার কারণ (যেমন রোগীর মেয়াদি শ্বাসকষ্টের ইতিহাস) থাকে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। চল্লিশোর্ধ্ব রোগী যদি ধূমপায়ী হন বা তাঁর ধূমপানের ইতিহাস থাকে, তাহলে বক্ষ-বিশেষজ্ঞকে দ্রুত দেখাতেই হবে।।

মাঝারি মাত্রার হিমোপ্টিসিস-এর চিকিৎসা

মাঝারি মাত্রার হিমোপ্টিসিস মানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ মিলিলিটার রক্ত বেরোনো। এর চিকিৎসা মোটামুটি সামান্য হিমোপ্টিসিস-এর মতোই, তবে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

বড়ো মাত্রার হিমোপ্টিসিস-এর চিকিৎসা

চিকিৎসাক্ষেত্রে এটা একটা বড়ো 'ইমার্জেন্সি'। এতে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা আছে। এখানে ওষুধ ছাড়াও অপারেশনের দরকার হতে পারে।

এই ক্ষেত্রে হাসপাতালে, সাধারণত ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, ভর্তি করতেই হবে। রোগীকে বাঁচাতে যা যা করা করা যেতে পারে তার মধ্যে প্রথমেই আসে তার শ্বাসকার্য ঠিকঠাক চলছে কিনা সেটা দেখা ও প্রয়োজনে শ্বাসের নল পরানো, যেমন অজ্ঞান করার সময় অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট-রা পরিয়ে থাকেন। এতে শ্বাসনালীতে রক্ত জমে বা অন্য কোনোভাবে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুকে আটকানো যায়।

তারপর দেখতে হবে রক্তে অক্সিজেন-এর পরিমাণ ঠিক আছে কিনা, না থাকলে নল দিয়ে দ্রুত অক্সিজেন পাঠানো, শ্লেষ্মা বা জমা রক্ত সাকশন মেশিনের সাহায্যে টেনে বের করে দেওয়া। এছাড়া শিরা ফুঁড়ে তরল (চলতি বাংলায় 'স্যালাইন' বলে, কিন্তু শিরায় দেবার সব তরলই স্যালাইন নয়) ও রক্ত দেওয়া দরকার হয়, রোগীর রক্ত জমাট বাঁধার কোনো সমস্যা আছে কিনা দেখতে হয় ও সেইমতো প্লেটলেট বা অন্য ওষুধ দেওয়া হয়।

➢ বুকের এক্স-রে ফটো, বা দরকারে ব্রঙ্কোস্কোপি বা সিটি স্ক্যান, দ্রুত করে দেখতে হবে ঠিক কোন জায়গা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

➢ রক্ত বেরোনো বন্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা হতে পারে—

❖ অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ও এমবলাইজেশন—এর কৃৎকৌশলগত খুঁটিনাটিতে যাচ্ছি না। মোটের ওপর কোন শিরা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে তা খুঁজে বার করে শিরার মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে একটা বাধা তৈরি করা হয়। তাতে শিরাটি যেখানে ফুটো হয়ে গেছে তার আগে রক্তপ্রবাহ আটকে যায়; তখন শিরা থেকে রক্ত পড়া আপ্‌সে বন্ধ হয়ে যায়।

➢ ফুসফুসে নল পাঠিয়ে চিকিৎসা

❖ ফুসফুসে নল পাঠিয়ে বরফ-ঠান্ডা নুনজল দিয়ে রক্তপাতের জায়গা ধোয়া, এতে রক্ত বন্ধ হতে পারে।

❖ রক্তপাতের জায়গায় থ্রমবিন (রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে) ইত্যাদি ইঞ্জেকশন করে রক্তনালী বন্ধ করা।

❖ বেলুনের মতো একটা সম্প্রসারণশীল জিনিস শিরার মধ্যে ঢুকিয়ে সেটা ফুলিয়ে শিরার রক্ত চলাচল (ফলে রক্তপাতও) বন্ধ করা।

➢ লেজার রশ্মির সাহায্যে রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেওয়া।

➢ অপারেশন

❖ অপারেশন করে ফুসফুসের যে অংশ থেকে রক্তপাত হচ্ছে সেটা, ফুসফুসের একটা লোব (মানে অর্ধেক ফুসফুস, বা কিছু কম), এমনকী গোটা ফুসফুস বাদ দেবার দরকার হতে পারে।

মনে রাখতে হবে এরকম জরুরি অবস্থায় অপারেশন করা খুব শক্ত। রোগী মারা যাবার সম্ভাবনা বেশ বেশি, আর সহজেই সংক্রমণ হয়ে তা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই বুকে চোট পেয়ে রক্তপাত বা ডাক্তারি করতে গিয়ে ফুসফুসের মহাশিরা ছিঁড়ে যাওয়া—এই দুটো কারণ ছাড়া ডাক্তাররা অপারেশন করতে চান না।

➢ রেডিওথেরাপি—এটা কিছু টিউমার ওফুসফুসে অ্যাসপার-জিলাস নামক ছত্রাক সংক্রমণে কাজে লাগে।

➢ অ্যান্টিফিব্রিনোলাইটিক দিয়ে চিকিৎসা—খুব কম ক্ষেত্রেই করা হয়।

সাময়িক আরাম দেবার চিকিৎসা

ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে হিমোপ্টোসিস হলে বা লিউকেমিয়া থাকলে, তার চিকিৎসা করার সময় রোগীর বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা কত সেটা একটু মাথায় রাখা উচিত। প্রবল হিমোপ্টোসিস-এর প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য বা বিপজ্জনক চিকিৎসা তখনই করা উচিত যখন রোগীর এমনিতে অনেকদিন বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বাঁচার সম্ভাবনা যত কম দিনই হোক না কেন, হিমোপ্টোসিস-এর কষ্ট ও ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে রোগীকে মুক্তি দেবার চেষ্টা সবসময়েই করতে হবে। এখানে জোরালো (আফিম গোত্রের) বেদনানাশক দিতে পিছপা হবার কারণ নেই, আর শরীর থেকে বেরোনো ভীতিপ্রদ রক্তকে রোগীর চোখের আড়ালে রাখা দরকার। ফুসফুসের ক্যান্সার বা লিউকেমিয়া রোগীদের বড়ো মাত্রার হিমোপ্টিসিস হলে সাধারণ রোগীদের মতো চিকিৎসা করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে।

রোগীর ভবিষ্যৎ

আগেই বলেছি, হিমোপ্টিসিস সামান্য একটা অসুবিধামাত্র হতে পারে ও নিজে থেকে সেরে যেতে পারে। অন্যদিকে এটা গভীরে থাকা কোনো অসুখের এক লক্ষণ হতে পারে। তাই কী রোগ আছে না-আছে সেটার ওপরে হিমোপ্টিসিস রোগীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তবে যে কারণেই হোক, বড়ো হিমোপ্টিসিস নিজেই এক মৃত্যুদূত, তার তাৎক্ষণিক চিকিৎসায় অবহেলা কখনোই চলে না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেটে http://patient.info/in/doctor/haemoptysis ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে প্রাপ্ত।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ : ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

মাথা ব্যথার সাতকাহন

উন্নত জীবের মাথাতেই তার সকল উন্নতির ভার। আর সেই মাথারই যখন ব্যামো, সে সামান্য মাথাধরাই হতে পারে কিংবা তীব্র মাথা যন্ত্রণা, তখন দুর্ভাবনা বাড়ে। মাথাধরার নানা কথা লিখেছেন **ডা. অনিন্দিতা।**

চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগে যদি কেউ প্রায় প্রতিদিনই বা মাসে ১৫ দিন বা তার বেশিদিন ধরে মাথা ব্যথায় কষ্ট পান, তাহলে সেই ধরনের মাথা ব্যথাকে ক্রনিক মাথা ব্যথা বলা হয়। কিন্তু ক্রনিক মাথা ব্যথার রোগীরা চিকিৎসারত অবস্থায় সম্পূর্ণ নীরোগ থাকতে পারেন যদি তাঁরা সুচিকিৎসা পান। সুচিকিৎসা মানে শুধু ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া নয় সঙ্গে নানা বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলাও।

এখনও পর্যন্ত আমরা যা জেনেছি 'ব্যথা' নিজে কোনো রোগ নয়, বরং অন্য একটি রোগ বা শারীরিক অসুস্থতার উপসর্গ মাত্র। কিন্তু মজার বিষয়, মাথা ব্যথা বেশ ব্যতিক্রম। মাথা ব্যথা একাই কখনো কখনো অসুখ হয়ে ওঠে। মাইগ্রেন ও টেনশনজনিত মাথা ব্যথা এরকমই দু-টি মাথা ব্যথার ধরন। যেখানে তারা নিজেরাই রোগ। সাধারণ মাইগ্রেন ও টেনশনজনিত মাথা ব্যথার রোগীরা দীর্ঘদিন ধরেই ভুগে থাকেন।

এবার কয়েকটা পরিচিত বা সাধারণ মাথা ব্যথার বৈশিষ্ট্য ও চিকিৎসা নিয়ে দু-চার কথা বলা যাক।

মাইগ্রেন

সাধারণত মাইগ্রেনের ব্যথা পরিবেশের কোনো উদ্দীপক বা অন্য কোনো শারীরিক উদ্দীপনার কারণে শুরুও যেমন হতে পারে তেমনি মাথা ব্যথা বর্তমান থাকলে তা বেড়েও যেতে পারে।

তাই কারো মাইগ্রেন থাকলে তার যে যে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, সেগুলো হল—

১. উচ্চ শব্দ এড়িয়ে চলা।
২. যথেষ্ট পরিমাণে ঘুমানো (অনিদ্রা বা অতিনিদ্রা দুই-ই ক্ষতিকারক)।
৩. উত্তেজনা এড়িয়ে চলা।
৪. অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা।
৫. দৈনন্দিন শরীরচর্চা করা।
৬. মেডিটেশন করা।
৭. সময়মত খাওয়া-দাওয়া করা।

টেনশনজনিত মাথা ব্যথা

টেনশনজনিত মাথা ব্যথার নামেই মনে হতে পারে হয় টেনশনের থেকেই এই মাথা ব্যথার সূত্রপাত, তবে সেরকমটা না-ও হতে পারে। টেনশন হলে এই ধরনের মাথা ব্যথা বাড়তে পারে, তা নিশ্চিত, এবং মনে রাখতে হবে মাইগ্রেনের জন্য যে যে সাবধানতা নেওয়া দরকার, টেনশনজনিত মাথা ব্যথাতেও সেইসব সাবধানতা নেওয়া প্রয়োজন। টেনশনজনিত মাথা ব্যথা ও মাইগ্রেনের মাথা ব্যথা, মাথা ব্যথার বৈশিষ্ট্য ও ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসার দিক থেকে কিন্তু অনেকটাই আলাদা। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ডা. সুমিত দাশের লেখা 'মাথা যন্ত্রণা কি হবেই'-তে আছে।

আর যে সব মাথা ব্যথা কোনো রোগ নয় বরং বেশি করে ডাক্তার ও রোগীর 'মাথা ব্যথা'-র কারণ। যেমন—

ক. মেনিনজাইটিস

মেনিনজাইটিস হলে প্রবল জ্বরের সঙ্গে ঘাড় শক্ত হওয়া ও তীব্র মাথা ব্যথা দেখা দেয়।

খ. মাথার মধ্যে রক্তক্ষরণ

সাধারণত কোনো পথ দুর্ঘটনার দরুণ বা উচ্চ রক্তচাপের দরুণ মাথার মধ্যে রক্তক্ষরণ ঘটলে তীব্র মাথা ব্যথা হতে পারে। তার সঙ্গে বমিও হতে পারে।

গ. ব্রেন টিউমার

ব্রেন টিউমারের অন্যতম প্রধান উপসর্গ মাথা ব্যথা। তার প্রকৃতি ততটা তীব্র হয় না। কিন্তু একটা মাথা ব্যথা ভাব থাকে।

ঘ. গ্লকোমা

গ্লকোমা একটি সাধারণ চোখের রোগ। গ্লকোমায় চোখে দেখার সমস্যা হয়, চোখ ব্যথা করে, তার সঙ্গে মাথা ব্যথাও করতে থাকে।

মাথা ব্যথার আরও কয়েক ধরন

কারও কারও শুধুমাত্র ঠান্ডা কিছু খেলে (আইসক্রিম জাতীয়) বা ঠান্ডা বায়ুতে নিশ্বাস নিলে মাথা ব্যথা হয়, তাদের ক্ষেত্রে ঠান্ডা কিছু নিতে বারণ করা হয়। কারও কারও অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাথা ব্যথা বাড়ে, তাদেরকে পরিশ্রমসাধ্য কাজ কম করতে বলা হয়। আর সেই ব্যথাটা যেটা ঠিক মাথার পিছনের দিকেও হয়। সেই মাথা ব্যথার কারণ কিন্তু স্পন্ডোলাইসিস হতে পারে।

তাই মাথা ব্যথায় অনেকরকম, তবে আমরা অনেকেই ভুগেছি জ্বর ও মাথা ব্যথা একসঙ্গে। তবে মাথা ব্যথা বেশ সাধাসিধে। জ্বরের কারণ নিরাময় হলে মাথা ব্যথাও শেষ হয়।

এত কিছু জানার পর যখন পাশের বাড়ির দিদা এসে দুম করে বলে—'না না ঠিক মাথা ব্যথা নয়, মাথাটা ধরে আছে।' অমনি তুমি ভ্যাবচ্যাকা খেলে, মাথা ধরাটা তবে কী? মাথা ব্যথাই না অন্য কিছু?

আসলে মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা মাথার অস্বস্তিরই তিন রকম উপলব্ধি। মাথা ব্যথার তীব্রতার ধরনই এই শব্দগুলো দিয়ে দিয়ে প্রকাশ করতে চাই আমরা। তাই অল্পস্বল্প মাথা ব্যথা বোঝাতে বলি 'মাথা ধরা', আর অতিরিক্ত মাথা ব্যথা বোঝাতে বলি 'মাথা যন্ত্রণা'।

মাথায় রাখার বিষয় যে মাথা ব্যথা অনেক ধরনের হতে পারে, অনেক কারণেও হতে পারে। নির্দিষ্ট কিছু মাথা ব্যথায় কিছু নির্দিষ্ট ওষুধেই রোগীর যথেষ্ট উপশম হয়। কিন্তু সবচেয়ে নিরাপদ মাথা ব্যথার উপশমকারী ওষুধ হল খুবই পরিচিত প্যারাসিটামল। তাই ডাক্তার না দেখানো পর্যন্ত সুধীজনদের নানা পরামর্শ নেওয়ার পরও মাথা ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ রোগীদের নিজে নিজে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্যারাসিটামলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অন্যান্য ওষুধের তুলনায় কম।

তাই শেষে বলি, লেখাটি পড়ার পর যাদের মাথা ধরবে তাঁরাও প্যারাসিটামল খেতে পারেন। যাঁদের মাথা ব্যথা হবে তাঁরাও প্যারাসিটামল খেতে পারেন। আর যাঁদের মাথা যন্ত্রণা হবে তাঁরাও প্যারাসিটামল খেতে পারেন। তবে কী পরিমাণে খেতে হবে তা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ঠিক করতে হবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনিন্দিতা, এমবিবিএস, কলকাতার একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তার।

Advt.

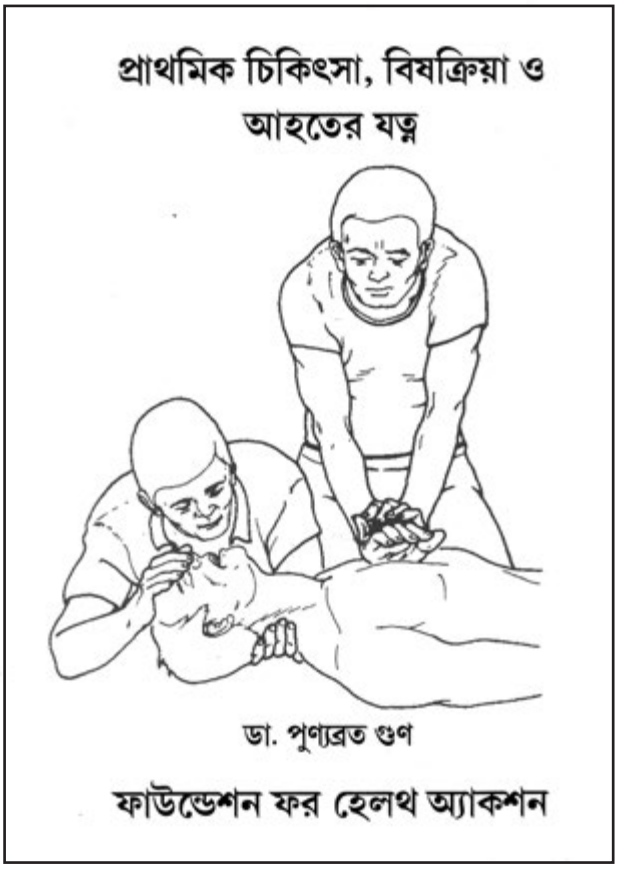

বার্ধক্যে চামড়ার ছত্রাক সংক্রমণ

ডা. অসিতরঞ্জন গোসাই

গ্রীষ্মকাল মানে প্যাচপ্যাচে গরম আর ঘর্মাক্ত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। জলের অভাবে ভালোমতো স্নান করাটা অনেকের কাছে বিলাসিতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। মানবদেহের সবথেকে বড়ো অঙ্গ হল ত্বক বা চামড়া। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে চামড়ায় নানা পরিবর্তন আসে। চামড়া কুঁচকে যায়, খসখসে হয়ে তৈলাক্তভাব চলে যায়। আজকের আলোচনা ছত্রাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

শরীরের যে সমস্ত জায়গা সচরাচর আবৃত থাকে, বাতাস যেখানে সহজে ঢুকতে পারে না, বিশেষত কুঁচকির ভাঁজে ভাঁজে, বগলের মধ্যে ও স্তনের নীচের দিকের অংশগুলোর চামড়াতে উদ্ভূত তপ্ত সিক্ত পরিবেশ ছত্রাকদের (fungus) উৎপত্তি ও বংশবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। এছাড়া মুখের ভিতরকার এবং যৌনাঙ্গের ভিতরের ঝিল্লি পর্দাতেও (mucous-membrane) ছত্রাক জন্মায়। চুল, নখ এইসব ত্বকের উপাঙ্গও ছত্রাক থেকে রেহাই পায় না। কিছু কিছু ছত্রাক কোনোভাবে দেহের অভ্যন্তরে রক্তরসের মধ্যে মিশে গেলে জীবনহানি ঘটে যায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। সেইসময় ছত্রাক সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। অতএব এর ছোঁয়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে আগেভাগেই।

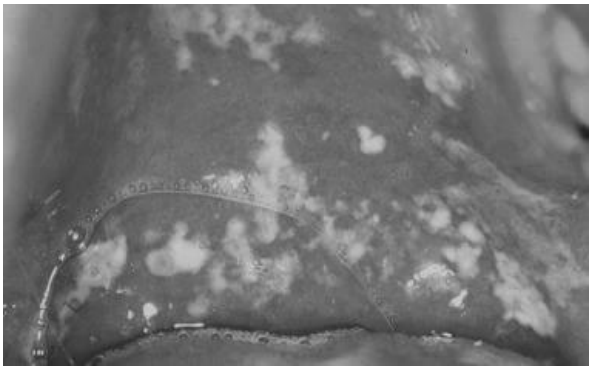

চিত্র ১. ক্যান্ডিডিয়াসিস

ক্যান্ডিডা এক প্রকারের ছত্রাক। তারা কুঁচকির ভাঁজে, বগলের মধ্যে ও স্তনের নীচের দিকের অংশগুলোর চামড়াতে লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে যেসব ব্যক্তি স্থূলকায়, ডায়াবেটিস কিংবা হাঁপানিতে আক্রান্ত, অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েড ওষুধের দ্বারা চিকিৎসিত হচ্ছেন, গলগণ্ড (hypothyroidism) রোগে আক্রান্ত অথবা যাদের রক্তে আয়রন, জিঙ্ক ইত্যাদি ধাতুর মাত্রা কম আছে, এই ছত্রাক তাদের বেশি আক্রমণ করে। যাঁরা আঁটোসাটো সিন্থেটিক জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরে থাকেন তাদের ক্যান্ডিডা বেশি হয়। এই ছত্রাক সংক্রমণের মূল লক্ষণ হল জ্বালাদায়ক এবং বিরক্তিকর চুলকানি। ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থানগুলো বিবর্ণ হয় ও হালকা আঁশযুক্ত হয়ে ওঠে। যেসব বয়স্কদের শারীরিক কারণে ডায়াপার ব্যবহার করতে হয়, তাঁদের কুঁচকি ও দাবনার পশ্চাদভাগ ক্যান্ডিডার বংশবৃদ্ধির একদম অনুকূল পরিবেশ। সাধারণত অন্তর্বাস বা ডায়াপার ঘন ঘন না বদলালে এইসব ছত্রাক বেশি হয়। এই ছত্রাক মুখের অভ্যন্তরে অর্থাৎ জিভ, মাঢ়ী, মুখগহ্বরের মধ্যেও জন্মায়। যেসব শিশু বোতলে দুধ পান করে অথবা চুষিকাঠি মুখে থাকে তাদের বেশি পরিমাণে ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস হয়।

চিত্র ২. ছুলি

ম্যালাসাজিয়া (malassezia) জাতীয় একশ্রেণির ছত্রাক ছুলি রোগের (pityriasis versicolor) কারণ। এই রোগে ত্বকের বিভিন্ন অংশে যথা বুকে, বাহুতে, পিঠে, মুখমণ্ডলে হালকা বা ঈষৎ লালচে বর্ণের ছোপ ছোপ দাগ লক্ষিত হয়। এই ছত্রাক পরিবেশগতভাবে (symbiosis) প্রায় সকলেরই ত্বকে বেঁচে থাকে। অনুকূল পরিবেশ পেলে কম প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত (immune compromised) ব্যক্তিদের, যেমন যাঁরা ডায়াবেটিস আক্রান্ত কিংবা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করছেন অথবা HIV সংক্রমিত, তাঁদের চামড়ার একদম উপরের স্তরকে (superficial layer) আক্রমণ করে, অবশ্য স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের দেহেও এই ছত্রাক রোগ ঘটাতে পারে। এই ছত্রাক সহজেই একজনের থেকে অন্যজনের চামড়ায় সংক্রমিত হতে পারে, বিশেষ করে সেই ব্যক্তি যদি আক্রান্তের জামাকাপড়, গামছা ইত্যাদি ব্যবহার করেন।

চিত্র ৩. দাদ

দাদ (ring worm) আর একরকম ছত্রাকঘটিত রোগ। রিং ওয়ার্ম-এর স্পোর মাটিতে সুপ্ত অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকে। এই

স্পোরের দ্বারা জীবজন্তুরাও আক্রান্ত হয়। সাধারণভাবে এই রোগে একজন মানুষ থেকে অন্যজন সংক্রামিত হন, তবে জীবজন্তুদের থেকে সংক্রমণ মানবশরীরে প্রবাহিত হতে পারে। দাদের লক্ষণ হল আক্রান্ত ত্বক লালচে এবং পার্শ্ববর্তী অংশ থেকে সামান্য একটু উঁচু দেখায়, চারিপাশ ঘিরে আঁশযুক্ত প্যাচ দেখা যায়। মধ্যবর্তী অংশ পরিষ্কার (central clearing) থাকে। প্রচণ্ড মিশমিশ করে আর চুলকায়। যখন এটা মাথায় হয় তখন আক্রান্ত স্থান থেকে চুল খসে পড়ে। ওই অংশটা গোলাকার টাকের আকৃতি নেয়। দাড়িতেও অনেক সময় হয় এবং সেই স্থানে কোনো চুল থাকে না (sycosis barbae)।

হাত ও পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চামড়া যদি আর্দ্র থাকে তাহলে ছত্রাক সংক্রমিত হতে পারে ও ক্ষত সৃষ্টি করে। পায়ে ক্ষত হলে তাকে 'Athlete's feet' বলে। যেসব লোকের হাত ও পা দীর্ঘক্ষণ জলীয় সংস্পর্শে থাকে তাদের এই অসুখ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ছত্রাক বিভিন্ন প্রকারের সংক্রমণ করে। হাত ও পায়ের নখে একধরনের

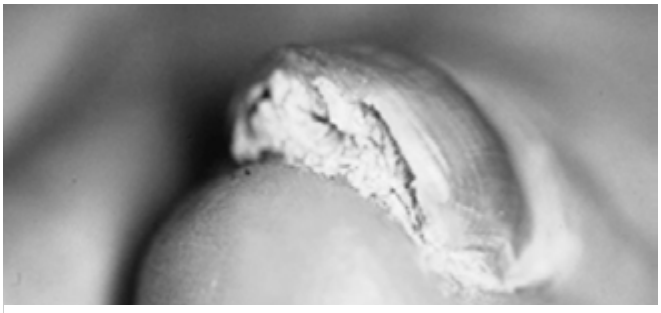

চিত্র ৪. নখে ছত্রাক সংক্রমণ

ছত্রাকঘটিত ক্ষত হয় (onychomycosis), যার দরুন নখ ক্ষয়ে যাওয়া, বিবর্ণ হওয়া, নখের আকারের বিকৃতি পর্যন্ত ঘটে। চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ আক্রান্ত অংশের থেকে সামান্য আঁশ ঘষে তুলে নিয়ে সেই নমুনা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হন।

চামড়ার উপরের স্তরের অসুখ (superficial fungal infection) অতি সহজেই নিরাময় হয় যদি জায়গাটিকে সর্বদা শুষ্ক রাখা যায় এবং সারাদিনই ২ থেকে ৩ বার ছত্রাকনাশক ক্রিম (antifungal cream) ঠিকমতো লাগানো যায়। চুলকানি খুব বেশি হলে তবেই antihistamine জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ কখনোই নয়। কোনো কোনো সময় দ্রুত রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ছত্রাকনাশক ও স্টেরয়েডের মিশ্রিত যৌগ মলম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা কখনোই করা উচিত নয়। যখনই এই মলম লাগানো বন্ধ করা হয়, তখনই রোগের উপসর্গ ফিরে আসে। স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করলে বা তার মলম লাগালে ছত্রাকের বেঁচে থাকতে সুবিধা হয়। ছত্রাকের বৃদ্ধির সহায়ক কারণগুলো, বিশেষত আর্দ্রতা (moisture) ইত্যাদি যদি দূর করে ফেলা যায় তবেই ক্ষতের খুব তাড়াতাড়ি ও স্থায়ী নিরাময় সম্ভব। হাত ও পায়ের নখেও ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে। এই জাতীয় সংক্রমণ জলবাহিত। অসুখ দীর্ঘদিন ধরে থাকলে নখের আকৃতিগত পরিবর্তন হয়ে নখ বিবর্ণ, ভঙ্গুর ও নখের গায়ে লম্বা লম্বা আঁশের মতো দাগ দেখা যায়। সাধারণত নখ ও চুলের সংক্রমণ রোধ করতে হলে ছত্রাকনাশক বড়ি (Fluconazole, Itraconazole) ১-১২ মাস খেতে হয় ওষুধ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে। যেসব বয়স্ক ব্যক্তির ডায়াপার বা মূত্রবন্ধনী ব্যবহার করতে হয়, তাদের ডায়াপার নিয়মিত বদলানো উচিত। ডিসপোজেবল ড্রাই টেকনোলজি ডায়াপার ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী। বয়স্ক ব্যক্তিদের ত্বকের ভিজে থাকা ও জিঙ্ক, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর ঘাটতি দূর করতে হবে। যাদের ক্যাথিটার বা মূত্রবন্ধনী ব্যবহার করতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবহৃত জিনিস পরিবর্তন করা ও সেইসব জিনিস যথাযথ শোধন করার দিকে নজর দিতে হবে।

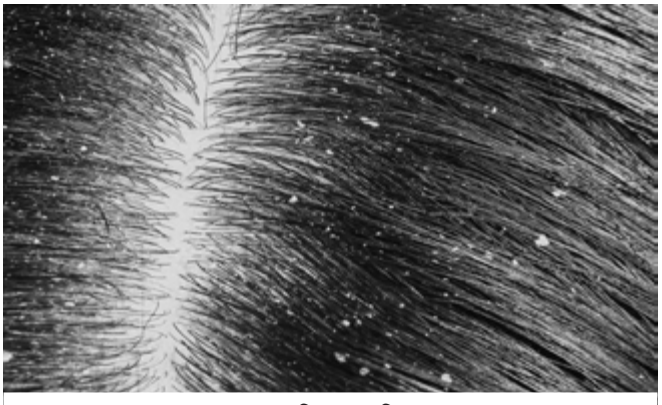

চিত্র ৫. খুশকি

মাথায় খুশকি (dandruff) এক বিশেষ ধরনের ছত্রাক, যা বয়স্ক ব্যক্তিদের সচরাচর হয়েই থাকে। এতে চুল খসে পড়ে যায়, মাথার ত্বকে ঘন আস্তরণ পড়ে, চুলের গোড়ায় মিশমিশ করে। খুশকি এড়াতে গেলে নিয়মিত পরিষ্কার জলে স্নান ও মাঝেমাঝেই মাথার চুল শ্যাম্পু (Keokonazole) দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত। পুকুর বা বদ্ধ জলাশয়ে একদমই স্নান করা উচিত নয়।

আমাদের সমাজে বয়স্করা ভীষণভাবে অবহেলিত। তাঁরা নিজেরা নিজেদের চামড়ার যত্ন নিতে পারেন না, আর তাঁদের ঠিকমতো দেখভাল করার লোকেরও অভাব। তাই ছুলি জাতীয় অসুখ বয়স্কদের ভীষণভাবে হয়। ম্যালাসাজিয়া ছত্রাক এর অন্যতম কারণ। মুখে, পিঠে, বুকে ছোটো ছোটো আঁশযুক্ত দাগ ভর্তি হয়ে যায়। ছুলিতে কিটোকোনাজল লোশন ভালো কাজ করে। সবসময় পরিষ্কার জলে স্নান করা দরকার। বয়স্ক মহিলাদের যোনিপথে থকথকে দই-এর মতো সাদা স্রাব, তার সঙ্গে জ্বালাভাব অনেক ক্ষেত্রেই হয়। এটা একধরনের ছত্রাক আক্রমণ, ভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। এসব ক্ষেত্রে সংকোচ না করে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ অবশ্যকর্তব্য। অনেক সময় বয়স্ক দম্পতিদের একসঙ্গে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়।

কখনো কখনো বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতে, বিশেষত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে কিছু কিছু ব্যক্তির প্রতিরোধী শক্তি কমে গিয়ে চামড়াতে নানারকম ছত্রাকের সংক্রমণ হয়। এইসব ক্ষেত্রে অতি সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। চামড়াতে ছত্রাক সংক্রমণের চিকিৎসা বিলম্বিত করা বা বাজার-চলতি কিছু মলম লোশন নিজের ইচ্ছেমতো লাগানো কখনোই উচিত নয়। মনে রাখতে হবে ছত্রাক মানবদেহের অভ্যন্তরে কোনোভাবে প্রবেশ করে রক্তে মিশে গেলে জীবনসংশয় ঘটতে পারে।

ছত্রাক সংক্রমণ ছাড়াও বয়স্কদের কিছু রোগলক্ষণ বিশেষ করে নজরে রাখতে হয়।

বয়স্কদের ত্বকে উদ্বেগজনক লক্ষণ:

১. আঁচিলের আকার, রং ইত্যাদির পরিবর্তন।

২. কোনো ওষুধ সেবনে পরবর্তী সময়ে ত্বকে ফোসকা বা লালচে ঘা, এটা জীবনসংশয়ী হতে পারে।

৩. হঠাৎ করে সর্বাঙ্গে জ্বালা, চুলকানি দেহাভ্যন্তরের কোনো জটিল অসুখের লক্ষণ হতে পারে।

৪. পায়ের নীচের অংশে দানা দানা লালচে র‍্যাশ শরীরের রক্তজালিকার প্রদাহের কারণ হতে পারে।

৫. শরীরের শতকরা ৯০ ভাগ যদি লাল প্রদাহে (Erythema) আক্রান্ত হয় তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

৬. শ্বাসকষ্টের সঙ্গে চামড়াতে চাকা চাকা দাগ (Urticaria) দেখা গেলে জীবনসংশয়ের কারণ হতে পারে।

৭. মুখগহ্বর ও যোনিপথের মিউকাস মেমব্রেন-এ বহুদিনের ঘা খারাপ লক্ষণ।

৮. বয়স্ক লোকেদের শারীরিক দুর্বলতা, সর্বাঙ্গে ব্যথা ও তার সঙ্গে চামড়ার র‍্যাশ যা রোদের তাপে বেড়ে গিয়ে অসহ্য জ্বালার অনুভূতি দেয়, তাহলে কঠিন অসুখের কথা (Dermatomyositis) চিন্তা করতে হবে এবং চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সত্বর যোগাযোগ করতে হবে।

৯. চামড়ার কোনো ক্ষত দীর্ঘদিন ধরে থাকলে অবহেলা না করে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অসিতরঞ্জন গোসাই, এম বি বি এস, ডি পি এইচ, ডি জি এম, সরকারি স্বাস্থ্য প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে জেরিয়াট্রিক মেডিসিন নিয়ে কর্মরত ও কলকাতা পৌর নিগমের সঙ্গে যুক্ত।

Advt.

ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্রাসি আয়োজিত

ড. অভী দত্ত-মজুমদার স্মারক বক্তৃতা ২০১৭

২২ জুন, ২০১৭

স্থান: ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট (কলেজ স্কোয়ার)

সময়: বিকাল ৫টা-৮টা

বিষয়: অসহিষ্ণুতা এবং বিপন্ন গণতন্ত্র।

বক্তা: শ্রীমতী নন্দিনী সুন্দর, অধ্যাপক, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রী শুভজিত বাগচী, বিশিষ্ট সাংবাদিক

সঞ্চালক: সুজাত ভদ্র

সভামুখ্য: ড. রণবীর সমাদ্দার

প্রবেশ অবাধ

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

গর্ভবতী মায়ের কী কী খাওয়া উচিত

গর্ভাবস্থায় সঠিক খাদ্য গ্রহণের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে স্বাভাবিক প্রসব। মা ও শিশুর শারীরিক পুষ্টি। অপুষ্টিতে ভোগা মায়েদের সন্তানও অপুষ্টিতে তো ভুগবেনই; এছাড়া আরও নানা জটিলতা আসতে পারে। সেজন্যেই গর্ভবতীরা কী কী খাবেন সেটা জানা জরুরি। সেসব কথাই বিশদে জানাচ্ছেন **জুনি ঘোষ**।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ভ্রূণের দ্রুত বেড়ে ওঠা ও মায়ের শরীরের নানা পরিবর্তনের কারণে একজন সাধারণ মহিলার থেকে গর্ভবতী মহিলার পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও বাড়তে থাকে। গর্ভবতী মহিলার পুষ্টির ওপর নির্ভর করে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি। মা যদি রুগ্ন হন বা অপুষ্টিতে ভোগেন তাহলে তিনি কখনোই স্বাভাবিক ও সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে সন্তান অপরিণত, রুগ্ন, এবং কখনো-কখনো বিকলাঙ্গ বা মৃতও হতে পারে। গর্ভকালে যেসব মায়েদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের অকাল গর্ভপাত হয় এবং তারা নানান রোগে আক্রান্ত হয়।

UNICEF-এর হিসাব অনুযায়ী এশিয়া ও আফ্রিকায় পাঁচ বছর বয়সের নীচে শিশুমৃত্যুর কারণের প্রায় ৫০ শতাংশ হল অপুষ্টি। আর শিশুদের অপুষ্টির বিচারে আমাদের দেশ পৃথিবীর সবথেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। আবার শিশুর অপুষ্টির মূল কারণ হল শিশু জন্ম দেওয়ার আগে গর্ভাবস্থায় মায়েদের পুষ্টিগত চাহিদা ঠিকঠাকভাবে পূরণ না হওয়া। তাই গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গেলে এবং তার শারীরবৃত্তীয় চাহিদা পূরণের জন্য তার দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা প্রয়োজন, যাতে মায়ের স্বাস্থ্যের সঙ্গে শিশুর স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

গর্ভাবস্থায় পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধির কারণগুলি হল

- ভ্রূণের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য।
- স্তন ও জরায়ু কলার বৃদ্ধির জন্য।
- অ্যামনিয়টিক তরল গঠনের জন্য।
- অমরা বা প্লাসেন্টার বিকাশ সাধনের জন্য।
- গর্ভকালীন মায়ের রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য।
- ভ্রূণের অস্থি ও কঙ্কালতন্ত্র গঠনের জন্য।
- গর্ভাবস্থায় শারীরবৃত্তীয় যে অভিযোজনগুলি হয়ে থাকে অর্থাৎ মৌল বিপাক, পৌষ্টিকতন্ত্রের সক্রিয়তা, বৃক্কীয় কাজ, রক্তের উপাদান, দেহের জলসাম্য, দেহের ওজন—এই সব কিছুরই দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য।

গর্ভাবস্থায় মায়েদের কী কী সমস্যা হতে পারে

টক্সেমিয়া ও ইক্ল্যাম্পসিয়া

গর্ভবতী মায়ের রক্তচাপ বেশি থাকলে (এক্ষেত্রে ডায়াস্টলিক রক্তচাপ ৯০ মিমি পারদস্তম্ভ বা তার বেশি হয়) গর্ভাবস্থায় ২০ সপ্তাহ পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টক্সেমিয়া ও ইক্ল্যাম্পসিয়া হয়ে থাকে। এর সঙ্গে ইডিমা দেখা যায় এবং মূত্রে প্রোটিনের (অ্যালবুমিন) পরিমাণ বেড়ে যায়। টক্সেমিয়ার ফলে অনেক সময় গর্ভবতী মহিলা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশু মারা যায়।

টক্সেমিয়ার প্রধান কারণ হল অপুষ্টি। টক্সেমিয়া দেখা দিলে গর্ভবতী মহিলাকে উচ্চ জৈবমূল্য সমৃদ্ধ প্রোটিন জাতীয় খাবার দিতে হবে এবং এর সঙ্গে ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজন। আগে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য খাদ্য লবণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করা হত। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে, গর্ভবতী মহিলাদের খাদ্যলবণ বিশেষ প্রয়োজন। সেই কারণে বর্তমানে স্বাভাবিক পরিমাণেই খাদ্যলবণ দেওয়া হয়ে থাকে।

অ্যানিমিয়া

অ্যানিমিয়া ও রক্তাল্পতা গর্ভবতী নারীদের একটি সাধারণ সমস্যা। গর্ভবতী মহিলারা যেসব অ্যানিমিয়া রোগে ভোগেন সেগুলি হল:

১. লোহার অভাবজনিত অ্যানিমিয়া: গর্ভাবস্থায় লোহার চাহিদা অনেক গুণ বেড়ে যায়, ফলে খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে লোহার পরিমাণ না থাকলে অ্যানিমিয়া অবশ্যম্ভাবী। লোহার অভাবে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বিশেষভাবে কমে যায়। ১০০ মিলিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ১০ গ্রামের কম হলে, সেই অবস্থাকে অ্যানিমিয়া বলা হয়।

২. মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া: ফোলিক অ্যাসিডের অভাবে রক্তে হিমোগ্লোবিন তৈরি হতে না পারায় এ ধরনের অ্যানিমিয়া হয়ে থাকে। ভিটামিন বি১২-এর অভাবেও এই অ্যানিমিয়া হয়। তাই গর্ভাবস্থায়

ফোলিক অ্যাসিড ও ভিটামিন বি১২ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

৩. রক্তক্ষরণজাত অ্যানিমিয়া: এই ধরনের অ্যানিমিয়া গর্ভাবস্থার তুলনায় প্রসবের পর বেশি করে দেখা যায়, কারণ প্রসবের সময় প্রচুর রক্তপাত ঘটে। যেসব মহিলারা ঘন ঘন অন্তঃসত্ত্বা হন তাদের এধরনের অ্যানিমিয়া দেখা যায়।

বমিবমি ভাব ও বমি

এটিকে সাধারণভাবে মর্নিং সিকনেস বলে। সাধারণত গর্ভবতী মহিলাদের প্রথম অবস্থায় এধরনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সাধারণত বমি বমি ভাব বা বমি হয় বলে এধরনের সমস্যাকে মর্নিং সিকনেস বলে। মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ প্রভৃতি কারণে এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে।

কোষ্ঠকাঠিন্য

এটি গর্ভবতী মহিলার একটি গৌণ সমস্যা। ভ্রূণের আয়তন বৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্ন অংশে চাপ পড়ে এবং তার ফলে মল নিষ্কাশনে অসুবিধা হয়ে থাকে, যার কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়। এই সমস্যা কমানোর জন্য গর্ভবতী মহিলাদের রাফেজ বা ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। খোসা সমেত ফল (পেয়ারা, আপেল, নাসপাতি, সবেদা), ভুসিসমেত আটার রুটি, ফলের রস এবং সবুজ শাকসবজি খাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনোই ল্যাকজেটিভ (জোলাপ বা মল সাফ করে এমন ওষুধ) খাওয়া উচিত নয়।

হাত পা ফোলা

এই পরিস্থিতিকে ইডিমা বলা হয়ে থাকে। এরূপ হলে বুঝতে হবে শরীরে জল জমতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে খাদ্য লবণের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে।

হাতে-পায়ে খিল ধরা

হাতে-পায়ে খিল ধরার কারণ হল মাংস পেশির হঠাৎ সংকোচন। ক্যালশিয়াম ও ফসফরাসের সমতা বজায় না থাকলে এরূপ ঘটে।

বুক জ্বালা

গর্ভাবস্থায় অনেক সময় বুক জ্বালা করে থাকে। এসময় প্রচুর জল খাওয়া উচিত এবং ভাজাভুজি খাবার বেশি না খাওয়াই ভালো।

গর্ভবতী মহিলার পুষ্টিগত চাহিদা

গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদানের চাহিদা মেটাবার জন্য গর্ভবতী মহিলাকে অতিরিক্ত খাদ্য ও ক্যালোরি সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন।

ক্যালোরির প্রয়োজনীয়তা

গর্ভবতীর দেহের ওজন বৃদ্ধির কারণে ও বিশেষ কিছু শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত ক্যালোরির প্রয়োজন হয়ে পরে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে এই ক্যালোরির চাহিদা বৃদ্ধিই পায়। ICMR সুপারিশ

অনুযায়ী গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ৩৫০ কিলোক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন হয়।

প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা

WHO-এর বিশেষ দলের মতে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ ও মাতৃকোশে প্রায় ৯১০ গ্রাম প্রোটিন সঞ্চিত হয়। দেখা গেছে দৈনিক ৫ গ্রাম প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেই এই চাহিদা মেটে। কিন্তু বর্তমানে ICMR ভারতীয় মহিলাদের জন্য দৈহিক ১৫ গ্রাম অতিরিক্ত প্রোটিনের সুপারিশ করেছেন। এই চাহিদা মেটাবার জন্য গর্ভবতী মহিলাকে প্রতিদিন ভালো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে যেমন—দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, সোয়াবিন প্রভৃতি।

খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা

খনিজ লবণের মধ্যে ক্যালশিয়াম ও লোহার প্রয়োজনীয়তা গর্ভাবস্থায় সবচেয়ে বেশি থাকে। ভ্রূণের অস্থির বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য ক্যালশিয়ামের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ICMR-এর পুষ্টি-বিজ্ঞানীদের মতে গর্ভবতী মহিলার দৈহিক ৫০০-৬০০ মিলিগ্রাম অতিরিক্ত ক্যালশিয়ামের প্রয়োজন। দুধ ও দুগ্ধ জাতীয় উপাদান, ডাল ও শুঁটি জাতীয় খাদ্য উপাদান, সবুজ শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে ক্যালশিয়ামের চাহিদা মেটানো যায়।

গর্ভবতীর একজন স্বাভাবিক মহিলার তুলনায় অধিক লোহার প্রয়োজন হয়। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত লোহার চাহিদা বৃদ্ধির কারণ:

- ভ্রূণের রক্তে লোহা সঞ্চিত হওয়ার জন্য।
- ভ্রূণ ও প্লাসেন্টার বৃদ্ধির জন্য।
- শিশুর যকৃতে লোহা সঞ্চয়ের জন।
- মা ও ভ্রূণের হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য।

এই কারণেই একজন গর্ভবতী মহিলার প্রতিদিন অতিরিক্ত ১০ মিলিগ্রাম লোহার প্রয়োজন হয়।

ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা: গর্ভাবস্থায় সকল ভিটামিন মূলত ভিটামিন A, B-কমপ্লেক্স, C, D এবং ফোলিক অ্যাসিডের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই সকল ভিটামিন ভ্রূণের বৃদ্ধি, গঠন ও মায়ের শরীরের অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

গর্ভবতী মহিলার জন্য সুষম খাদ্য

গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদানের চাহিদা মেটানোর জন্য গর্ভবতী মহিলার যেভাবে খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন—

সমস্ত রকমের দানাশস্য এই সময় দেহে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন। বিশেষত যারা ভাতের উপর নির্ভরশীল তাদের জন্য একাধিক রকমের দানা শস্য গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন, যেমন— ভুসিসমেত আটার রুটি, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টার তৈরি আটার রুটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি ও ফাইবার সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। ICMR-এর সুপারিশ অনুযায়ী গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ৫০ গ্রাম দানাশস্য গ্রহণ করা উচিত।

কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে, যেমন গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ডাল গ্রহণের ফলে পেট ফুলে যাওয়া বা পেট ফাঁপা হতে পারে, যা আদৌ সত্যি নয়। বিভিন্ন রকমের ডাল, শুঁটি জাতীয় খাদ্য উপাদান, অঙ্কুরিত ছোলা গর্ভবতী মহিলার উচ্চ জৈবমূল্য সমৃদ্ধ প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন। একই রকমের ডাল না খেয়ে অনেক প্রকারের ডাল একসঙ্গে মিশিয়ে খেলে পুষ্টিমূল্য আরও বেড়ে যায় এবং এটি সহজপাচ্য।

ডাল ছাড়াও দুধ ও দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমেও মায়ের অতিরিক্ত প্রোটিনের চাহিদা মেটানো প্রয়োজন। গর্ভবতী মহিলার সাধারণ মহিলার তুলনায় অতিরিক্ত ১২৫ গ্রাম দুধ গ্রহণ করা উচিত। যারা আমিষ খাবার গ্রহণ করেন তাদের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিমের মতো প্রাণীজ প্রোটিন থাকা দরকার।

যেহেতু একজন গর্ভবতী মহিলার গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ভিটামিন ও মিনারেল-এর প্রয়োজন থাকে তাই এই সময় অন্য সময়ের তুলনায় বেশি পরিমাণে সবুজ শাক পাতা, অন্যান্য সবজি, মাটির তলার সবজি, ফল খাওয়া উচিত। এর সঙ্গে সঙ্গে ফল ও সবজি থেকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়।

সাধারণ ও গর্ভবতী মহিলার কম মূল্যের সুষম খাদ্যের (গ্রাম) তালিকা

খাদ্যবস্তু	সাধারণ মহিলা						গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত সংযোগ (গ্রাম)
	হালকা কাজ		মাঝারি কাজ		ভারীকাজ		
	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	
দানাশস্য	৩০০	৩০০	৩৫০	৩৫০	৪৭৫	৪৭৫	৫০
ডাল	৬০	৪৫	৭০	৫৫	৭০	৫৫	-
সবুজ শাকসবজি	১২৫	১২৫	১২৫	১২৫	১২৫	১২৫	২৫
অন্যান্য সবজি	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	১০০	১০০	-
মূল ও কন্দ	৫০	৫০	৭৫	৭৫	১০০	১০০	-
ফল	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	-
দুধ	২০০	১০০	২০০	১০০	২০০	১০০	১২৫
ঘি ও তেল	৩০	৩৫	৩৫	৪০	৪০	৪৫	-
চিনি ও গুড়	৩০	৩০	৩০	৩০	৪০	৪০	১০
মাংস ও মাছ	-	৩০	-	৩০	-	৩০	-
ডিম	-	৩০	-	৩০	-	৩০	-
ছোলা	৪০	৪০	৪০	৪০	৫০	৫০	৬০

এছাড়াও এই সময়ে সঠিক পরিমাণে তেল ও চর্বি জাতীয় খাবার, ঘি, মাখন, চিনি, মিষ্টি খাবার খেতে হবে।

সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও খাদ্য সম্পর্কিত ভুল ধারণার থেকে গর্ভবতী মহিলাকে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয় কারণ এর থেকে মায়ের স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় পুষ্টি উপাদানের চাহিদা মেটানোর জন্য গর্ভবতী মায়েদের আয়রন, ক্যালশিয়াম ও ফোলেট- এর সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা উচিত। যদিও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া এই সাপ্লিমেন্ট নেওয়া উচিত নয়। সাধারণভাবে গর্ভবতীদের খাওয়া-দাওয়ায় কোনো বাধানিষেধ নেই তবে অন্য কোনো রোগবালাই থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো খাবার খাওয়াই ভালো। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক নিউট্রিশনিস্ট, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

Advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)
অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

অষ্টম পর্ব

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর(১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে,২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল,পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বিধবা হওয়ার পর

বাড়ি ঢুকতে-না ঢুকতেই বাড়িময় কান্নার রোল উঠল। ‘ওরে রাক্ষসী! অমন জোয়ানমদ্দটাকে খেয়ে ফেললি! হতভাগী, এখন আমাদের ওই কালামুখ দেখাতে এসেছিস?’ এমন ‘দরদি’ অভ্যর্থনা পেয়ে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। কী করব আমি? চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। অশেষ দুঃখ কষ্ট আর খারাপ ব্যাভার সয়ে মায়ের কাছে এসেছি তাঁর কোলে মাথা রেখে আমার যা-কিছু রাগ-দুঃখ ঢেলে দেব বলে, আর এখন আমার বাপের বাড়ির লোকেরাই কি না আমাকে দুষছে: আমি ওই জোয়ানমদ্দটাকে রাক্ষসীর মতো খেয়ে ফেলেছি! মনমরা হয়ে পড়া ছাড়া আমার আর গতি কি! তাঁদের যাবতীয় শোকতাপ হাহাকার ওই বুড়ো মদ্যপ মাতাল আর লম্পট (বেবুশ্যে বাড়িগামী) লোকটার জন্যে। যে কি না কিছুদিনের জন্যে তাঁদের জামাই হয়েছিল। তাঁদের এই কান্নার বিলাপ আমার অসহ্য লাগছিল, কেননা এর মধ্যে আমার জন্যে ছিঁটেফোঁটা দরদও ছিল না।

এই নিষ্ঠুর নির্যাতন কী আমার পাবার কথা! কী করেছি আমি? শ্বশুর বাড়িতে গঞ্জনা সইতে হয়েছে: আমি তাঁদের জোয়ানমদ্দটাকে খেয়ে ফেলেছি। এখানেও ওই একই মদ্দটাকে খেয়ে ফেলার জন্যে আমাকে যাচ্ছেতাই রকমের বকুনি খেতে হচ্ছে। কোথায় যাব আমি? চোখে তো জল এসেই যায়, তবে মদ্দটার জন্যে নয় নিজের জন্যে—কেননা কেউই তো আমার মুখ দেখতে চাইছে না। সব পড়শিরা এসে গেল, তাঁরা আমার চোখে জল দেখে আহা বাছা করে কত কিছুই না ইনিয়ে বিনিয়ে বলে গেল: ‘বেচারা! এবারে ওর দশাটা বোঝার মতো বোধ ওর হয়েছে। আর কোনোদিনও কি ওর চোখে জল বাঁধ মানবে? এইটুকুন একটা মেয়ে, লেখাপড়ায় এমন দড়, আরও কত গুণ—তার কী কপাল!’ আর একজন বললে: ‘ওইটাই তো সব্বোনাশের গোড়া। সবাই জানে যে লিখতে পড়তে শিখলেই ও বিধবা হবে। তবে ওকে ওসব করতে দেওয়ার মানেটা কী?’

যাই করি না কেন, আমাকে নাগাড়ে গঞ্জনা শুনে যেতেই হচ্ছে, থামাথামির কোনো কথাই ওঠে না। এককথায়, আমি যে বিধবা হয়েছি তা পুরোপুরি নিজের দোষে। আমার প্রথম দোষ—লেখাপড়া শিখেছি; দ্বিতীয় দোষ—বাসরঘর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলাম; আর আমাকে যে ভূতে ধরেছিল, সেটা আমার তিন নম্বর দোষ। চার নম্বরটা হল—দেখতে সুন্দর হলে হবে কী, আমার শরীরে বালবিধবা হওয়ার সব লক্ষণগুলোই স্পষ্ট হয়ে ফুটেছিল। কেউ নাকি আমার মধ্যে সৌভাগ্যবতী বধূর শুভ লক্ষণ দেখতে পায়নি। এ সবকিছুর ওপরে আমার স্বভাব—হায়াশরমহীন গেছো একটা ডানপিটে মেয়ে। বিয়ের একবছরের মধ্যেই কেন একজনকে বিধবা হয়ে যেতে হয়? কষ্ট হয় তার বাপের বাড়ি-শ্বশুরবাড়ির কথা ভেবে—কী করে সামলাবেন তাঁরা এই জ্বলন্ত আগুনের গোলাকে। বউ-ঝিয়েদের দিনের খাওয়া-দাওয়া আর রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল আতঙ্কে আর আমার ওপর নজর রাখতে রাখতে। সকাল দুপুর বিকেল তাদের আড্ডায় রসালো খোশগপ্পের মধ্যমণি আমি। তাদের মধ্যে কথা চালাচালি হত—আমার কী খাওয়া উচিত, কী পরা উচিত, বিশেষ করে আমার বালা বা চুড়ি পরা ঠিক, না ঠিক না। সকলে মিলে রায় দিত, আমার বালা বা চুড়ি পরা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এইরকম নানা কথা ওরা বলতেই থাকত, বলতেই থাকত ইনিয়েবিনিয়ে . . .

এসব হৃদয়হীন লোকদেখানো 'দরদি' কথাবার্তা শুনে আমার গা জ্বলে যেত। এসব কথায় অন্তরের অন্তস্থলে যে কী ঘা খেতাম, বলে বোঝাতে পারব না। আর ভাবতাম এইসব লোকজনের বিষ নজর এড়িয়ে পালাবটা কোথায়? বারমহলে যাওয়ার তো কোনো কথাই ওঠে না, আর অন্দরমহলে দিন কাটানো অসম্ভব। শেষে ঠিক করলাম আমাদের বাড়িতে যে ঝি কাজ করতে আসেন, যাঁকে আমি 'চণ্ডীখুড়ি' বলে ডাকতাম—ওঁদের বাড়ির এই খোঁড়া বউটির সঙ্গেই সময় কাটাতাম। ঘুম থেকে উঠেই আমি ওঁর সঙ্গে কাজে হাত লাগাতাম। জল টানা, গোবর দিয়ে ঘর লেপা, ডাঁই ডাঁই বাসনকোসন মাজা, রান্নার জন্যে কাঠের গাদা থেকে নিয়ে কাঠ কাটা এতসব ভারী ভারী কাজ ওই খোঁড়া দুবলা বউটি একা হাতে পেরে উঠত না। ঠিকমতো রোজকার কাজ করে উঠতে না পারলে ওঁর শাশুড়ি ওঁকে বকেঝকে আর আস্ত রাখত না। আমি রোজই গিয়ে ওঁর কাজগুলো করে দিতাম: জল টানতাম, বাটনা বাটতাম, আনাজপাতির খোসা ছাড়িয়ে কেটে দিতাম তারপর রাঁধতেও শুরু করলাম। সবই করতাম কেবল কাপড় কাচা আর বাসন ধোয়া-মাজার কাজ ছাড়া। ও আমাকে সবসময় মানা করত। কিন্তু কাজ করতে করতে ওঁর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটার কষ্ট দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারতাম না।

পড়শিরা আমার নাগাল না পেয়ে মায়ের ওপর হামলে পড়ে দাঁতে কুটতে লাগল: হিঁদু ঘরের মেয়ে ও; তুমি কি বুঝতে পারছ না, ওর গায়ে গয়নাগাঁটি এখন মোটেই শোভা পায় না। আর ওকে মাছ খেতে দিয়ে যে ঘোর পাপ তুমি করে চলেছ; খেয়াল আছে তোমার? ও এমন একটা ভাব করছে যেন ও সধবা। তুমি তো এত বুঝদার, এসব কি খুব ভালো কথা? মা পর পর কয়েক দিন চুপচাপ ওদের বাক্যবাণ হজম করলেন; তারপর একদিন ওদের ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিলেন: তোমাদের এই গায়ে পড়ে শলাপরামর্শ দেওয়া কে চেয়েছে বলো তো? তোমাদের মেয়ে বা ছেলের বউ যখন এমন দশায় পড়বে তখন তোমরা রীতিনীতি সবকিছু মেনে দেখিয়ে বলতে এসো, তোমাদের কথা শুনব। এখন আর জ্বালিয়ো না তো বাপু; কাটা ঘায়ে আর কত নুনের ছিটে দেবে? পড়শিরা বুঝে ফেলল, হাওয়া সুবিধের নয়। আমাদের পরিবার থেকে তারা শাকসবজি আরও নানা এটা-সেটা মাগনায় পেয়ে যেত। তাই পলক ফেলতে-না-ফেলতেই ওদের সুর পালটে গেল: হক কথা, একদম ঠিক বলেছ তুমি। যার ব্যথা সেই বোঝে। আহা রে! অমন দুধের বাছা বউটা আমাদের; লোকজনের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, দশ কথা শোনাতে পারলেই হল! না গো, কারও কথায় কান দেবে না তুমি। ও একটা শিশু বই তো নয়, ওর যা খুশি খাবে, যা খুশি পরবে। মা এসব কথার কোনো জবাব দিলেন না। আস্তে আস্তে আমাকে নিয়ে পরিবারকে বেঁধা থেমে গেল, আমি ফের বাড়ির ভেতরে থাকতে শুরু করলাম।

ঠিক করলাম, ফের পড়াশোনায় মন বসাব। ভাইদের দিয়ে মাস্টারমশাই-এর থেকে বই আনালাম। পুবের ঘরে দোরে খিল এঁটে পড়তে বসে যেতাম। ভাইয়েরাই আমাকে পড়াত। প্রথম ক-টা দিন বাড়ির বউ-ঝি-রা আমাকে জিগেস করত: ও-ঘরে বসে কী করো তুমি? বলতাম: আমরা তাস খেলি। 'বাঃ, বেশ! ভালো কথা। খেলো খেলো, মন দিয়ে খেলো।' এই বলে ওরা তখনকার মতো চলে যেত। একদিন কেউ একজন ওদের কান ভাঙাল: ওরা মোটেই ও-ঘরে তাস খেলে না, পড়াশোনা করে। শুনে সকলেই রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা। 'কী, এতবড়ো সাহস! ফের পড়তে বসেছ? এই করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলে, আবার সেই একই কাজ করছ?' এবার আমি ওদের সামনে করালবদনা কালী হয়ে এলাম। ' যা করেছি, বেশ করেছি। আমি তো আর ফের বিধবা হব না। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন এইভাবেই, পড়াশোনা নিয়েই আমি থাকব। তাতে যে যা খুশি ভাবে ভাবুক। ইচ্ছে হলে তোমরা আমাকে চাবকাতে পারো, মেরেও ফেলতে পারো, তোমাদের যা মনে চায় করতে পারো—আমি আর তোমাদের কোনো কথায় কান দিচ্ছি না। এই আমার পণ—বলে দিলাম। আমার এই ভয়ংকর রূপ দেখে ওরা মনের আশ মিটিয়ে আমায় অশ্রাব্য-কুশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল। বাবাকে বললাম: এতদিন ওরা আমাকে পড়তে বাধা দিত, পড়লে আমি নাকি বিধবা হব। এখন তো আর সে-কথা খাটে না। এখন ওরা আমার লেখাপড়া আটকাতে চাইছে কেন? কোনো কারণ নেই, শুধু শুধু ওরা আমাকে যা-তা বলে বকাঝকা দিচ্ছে কেন? বাবা আমাকে ভরসা দিলেন: তোমার এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। বাবার কথা মেনে চললাম। সকালে ভাইদের থেকে পড়া বুঝে নিতাম, বিকেলে নিজে পড়তাম। কিছু দিন বাদে শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর এল, ওঁরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। আবার শ্বশুরবাড়ি! আমাকে ফের যেতে হবে কেন? আমি তো ভেবেছিলাম, ও-বাড়ির পাট বুঝি জীবনের মতো চুকেবুকে গেছে। কিন্তু যেতে তো আমাকে হবেই। কেননা শাশুড়ি যত দিন বেঁচেবর্তে আছেন, তিনি তো আমায় বাপের-বাড়ি-নির্ভর হয়ে থাকতে দিতে পারেন না।* কিন্তু আসল গপ্পোটা মোটেই তা নয়। ঠাকমা-দিদিমারা আমার লেখাপড়া বন্ধ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। ওঁরা আমার শাশুড়িকে খবর পাঠালেন: তিনি বেঁচে থাকতে আমার বাপের-বাড়ির আশ্রয়ে থাকাটা মোটেই ভালো দেখায় না। যে কথাটা ওঁরা লিখলেন না: ওঁদের আতঙ্ক, লেখাপড়া শিখে বিদ্যেবতী হয়ে আমি খেরেস্তান হয়ে যাব। সেজন্যেই ওঁরা ঠিক করলেন, শাশুড়িকে একটু খোশামোদ করবেন।

দিনকয়েক বাদে নৌকো এল আমাকে নিতে। আমি খুলনা চলে গেলাম। তোরঙ্গ থেকে বের করে বেশ কিছু বই সঙ্গে নিয়ে নিলাম। পড়তেও শুরু করলাম। কেউ কিছু বলছে না দেখে মনে একটু জোর পেয়ে রোজই পড়াশোনা চালিয়ে যেতাম। পড়তাম নিজে-নিজেই, একটা ডিক্‌শনারি হাতে নিয়ে। আমার একটা ইংরেজি আর গুটিকয়েক সংস্কৃত বই ছিল। খুবই কঠিন বই। অভিধান দেখে দেখে বাংলাটা আমি মোটামুটি ভালোই শিখেছিলাম। কিন্তু সে শেখায় এ বইগুলো পড়া যাবে না অথচ আমার ইংরেজি আর সংস্কৃত পড়ার প্রবল ইচ্ছে। কিন্তু তা আর কী করে হবে? কে আমায় পড়াবে? বাবা মাঝে মাঝে আসতেন

*বিধবা বউমা যদি পুরোপুরিই বাপের-বাড়ির আশ্রয়ে থেকে যেত, তবে তা তার শ্বশুরবাড়ির পক্ষে অমর্যাদাকর মনে করা হত।

বটে, কিন্তু সে সময় তিনি নানা রোগে ভুগছেন। তাঁকে রোগে এত কষ্ট পেতে দেখে আমার খুব মনে হত বাবার সঙ্গেই থাকি। কিন্তু পরিবারের শান্তি বজায় রাখার জন্যে বাবা আমাকে ডেকে পাঠাতেন না।

খুলনায় যতদিন ছিলাম আমাকে তেমন কোনো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়নি। দিনে একবেলা রান্না, বাকি গোটা দিনটা আয়েশ করে কাটিয়ে দেওয়া। মেজদি, মানে আমার মেজো-জা (স্বামীর মেজদার বউ) ও-বেলা রাঁধতেন। আমি নিজের মতো করে নিরুপদ্রবে লেখাপড়া করতে পারতাম। এইরকমই চলছিল বেশ কিছুদিন। শুনলাম, এবার ঠিক হয়েছে আমাদের শালকিয়ায় চলে যেতে হবে, কেননা মেজদির বাচ্চা হবে।

শালকিয়া নলডাঙার কাছে একটা গ্রাম। এখানে দুটি মাত্র সম্ভ্রান্ত পরিবার বাস করেন—একটি আমাদের, আর একটি বোসদের। বাকিদের মধ্যে কয়েক ঘর বোষ্টমি (জাত-বৈষ্ণব), আর কয়েক ঘর ধোপা। বাকি প্রায় সবাই বারুই (পান চাষি)। নদীর ওপারে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাস। আমাদের সামাজিক যোগাযোগ ওঁদের সঙ্গে বেশি। দু-ঘর জেলেও ছিল। চিত্রা নদীতে জল কমে আসছিল। এক-একটা সময় নদীতে জল প্রায় থাকতই না; মানুষজন হেঁটেই পারাপার করতে পারত। ওপারের গ্রামের মেয়েরা সরু নদীর পাড়ে এসে এপারের মেয়েদের সঙ্গে সুখদুঃখের গপ্‌পো জুড়ে দিত।

সে সময় মিত্র-বাড়ি চড়চড় করে বেড়ে উঠছিল। বিরাট বাড়ি, একই বাড়িতে অনেক লোকজন, একই হেঁশেলে রান্নাবান্না। অবস্থাপন্ন পরিবার। ওঁদের বাড়ির পরিবেশটা আমার কাছে খুব মনোরম মনে হত। ঝি-চাকরের কাজকর্মের ব্যস্ত হাঁটাচলায় বাড়িটা সবসময় গমগম করত, বিশেষ করে বাবুরা যখন বাড়ি ফিরতেন। ও-বাড়িতে যেসব কর্তারা মারা গিয়েছেন, তাঁদের বিধবা এবং ছেলেমেয়েরা ওই পরিবারেই থাকতেন। আমার স্বামীর বড়দা, তাঁর সঙ্গে যত ছেলেপুলে থাকত, সবাইকে পড়াতেন। তাঁর স্ত্রী ওদেরকে এতটাই ভালোবাসতেন, মনে হত যেন ওঁর নিজেরই ছেলেপুলে। যে ছেলেপুলেরা পরিবারের কেউ না, তারা এরকম একটা ব্যবস্থায় খুব খুশি। অসন্তোষের কোনো ধারণাই ওদের ছিল না। মহিলা সারাদিন রান্নাবান্না করতেন, ওদের খাওয়াতেন আবার বিকেলে ওদের জন্যে ভাজাভুজিও তৈরি করে রাখতেন। এতসব ঝক্কি পোয়াতে হয় বলে তিনি কিন্তু কোনোদিনও নালিশ জানাতে যাননি। বাড়িটায় একটা শান্তির পরিবেশ। বাড়ির কর্তার ছোটো জ্ঞাতি আশুতোষ পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে ওই বাড়িতেই থাকত।

এরপর আমরা মাগুরাতে গেলাম। কেননা, ফিরে যাওয়ার আগে শাশুড়ি তাঁর ছেলেদের সঙ্গে দেখা করে যেতে চান। আরও দুটো কারণ অবশ্য ছিল। ওঁর মেজ বউমার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বাচ্চা হবে, আর শাশুড়ি একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন, সেটাকে রীতি মেনে অনুষ্ঠান করে উৎসর্গ করা হবে। এই পরিবারটির সঙ্গে থাকতে পেরে আমি খুব খুশি ছিলাম। এঁদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি নেই, নেই কুসংস্কারে ভরা কথা চালাচালি, পরনিন্দা, পরচর্চা নেই—যেমনটা আমি নিজের গাঁয়ে দেখে এসেছি। আমার শাশুড়ি এসব কিছুর তোয়াক্কাই করতেন না। আমরা পড়াশোনা করতাম, রান্নাবান্না করতাম, নয়তো বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলায় দিন কাটত। তিনি আমাদের কোনোকিছুতে নাক গলাতেন না। সকালের রান্নাটা আমি রাঁধতাম আর বড়োদিদি মানে বড়ো-জা খাওয়ার বেড়ে দিতেন। ও-বেলার রান্নাটা তিনিই রাঁধতেন। সকালে তিনি শাশুড়ির জন্যে রাঁধতেন। বিকেলে আমি ওই বিশাল বাড়ির ছাউনি-দেওয়া খোলামেলা উঠোনে বসে বই পড়তাম। যেটা বুঝতাম না, ছেলেরা সেটা বুঝিয়ে দিত। এই সময়টাতে জ্যোতি, চন্দ্রশেখর, বিজয় আর মহেন্দ্র রোজই পালা করে আমাকে পড়া বুঝিয়ে দিত।

আমার স্বামীর জ্ঞাতিভাই, আশুতোষ আমাদের এই পড়াশোনাটাকে মোটেই ভালো চোখে দেখত না। সে বড়োদিদি (বড়ো জা) আর শাশুড়ির কাছে নালিশ জানাতে শুরু করল: ছোটো বউ খোলা ছাউনির তলায় জোয়ান ছেলেগুলোর সঙ্গে বসে থাকে। আমি জানি না সেখানে ওরা কী করে আর কী না করে। আপনার কি মনে হয় না খুড়িমা, ওদিকটায় কী হচ্ছে না হচ্ছে আপনার একটু নজর দেওয়া উচিত? এ-কথা শুনে শাশুড়ি আমাকে শুধোলেন: খোলা ছাউনির তলায় বসে তুমি কী করো? আমি অকপটে বললাম: লেখাপড়া করি। তিনি বললেন: লেখাপড়া করে হবেটা কী? আমি বললাম: আমাকে তো কিছু-না-কিছু নিয়ে থাকতে হবে।—জোয়ান ছেলেগুলো ওখানে কী করে?—ওরা আমাকে পড়া বুঝিয়ে দেয়। তিনি আর কিছু বললেন না। ধড়িবাজ আশু মিত্র বাঁ-হাতে বানিয়ে বানিয়ে একটা চিঠি লিখে কোথাও একটা লুকিয়ে রেখেছিল। একদিন সেটা বার করে আমার শাশুড়িকে পড়ে শোনাতে লাগল: শুনুন আপনার ছোটো বউয়ের কীর্তি! চিঠিতে লেখা ছিল: মিতে জ্যোতি, চন্দ্র! তোমাদের দুজনকেই আমি খু-উ-ব ভালোবাসি। তোমরাও কি আমাকে ভালোবাসো না? শুনে, আমি তো থ। এসবের মানে কী? আমি তো কোনোদিন কাউকে কোনো চিঠি লিখিনি। কে এরকম করে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা সাজিয়ে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে? আমি দৃঢ় অথচ নরম স্বরে শাশুড়িকে বললাম: 'এ চিঠি আমি লিখিনি। তাছাড়া আমি যদি আমার জা-এর ছেলেদের ভালোইবাসি, তাতে দোষটা কোথায়? সে জন্যে আমি ওদের গোপনে চিঠি লিখতে যাবই-বা কেন?' আমার অকপট সরলতায় শাশুড়ি বুঝতে পারলেন, এ-কাজ আমি করিনি, কেউ একজন আমার পেছনে লেগেছে। আশু মিত্র গোটা দিনটাই আমার শাশুড়ির ঘরে কাটাত, আর পাশেই খোলা ছাউনিতে বসে আমি পড়তাম। আমার ওখানে ঠায় বসে থাকাতে ওর হয়ত কিছু অসুবিধা হচ্ছিল। আমাকে ওখান থেকে হটিয়ে দেওয়ার জন্যেই তার এই চক্রান্ত। এরপর থেকে আমি শাশুড়ির ঘরে বসেই পড়তাম। তিনি কোনোভাবেই আমার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাতেন না। বিকেলে বিজয় এসে আমাকে পড়া বুঝিয়ে যেত।

ঠিক হল আমরা ফের শালকিয়া ফিরে যাব। ওখানে আমার শাশুড়ি একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন, সঙ্গে একটা ঘাটও বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। সেগুলোকে তো সনাতন নিয়ম মতে উৎসর্গ করতে হয়, সে জন্যে শাশুড়ি সেসবের দেখাশোনার ব্যবস্থাপত্র করতে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। পুকুর উৎসর্গের ঢের ঢের কাজ—কড়াইশুটি ছাড়িয়ে ভাজা, ভাত রান্না করা এমন আরও কত কী। আমরা যখন এসব কাজ

নিয়ে ব্যস্ত তখন মেজদি (মেজো-জা) বাড়ি ফিরে এলেন ও একটি ছেলের জন্ম দিলেন। বাচ্চার একুশ দিনের দিন ষষ্ঠী পুজো হল। বাচ্চার দেখাশোনার ভার আমিই নিয়ে নিলাম। এছাড়া আমাকে যা যা কাজ করতে হত সবই করতাম। শাশুড়ির দুই ছেলে পুকুর-উৎসর্গ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাড়ি চলে এল। শহরের বাড়ি ফাঁকা পড়ে রইল। এক মাস ধরে আমাদের দারুণ আনন্দে আর হইহুল্লোড়ে কেটে গিয়েছিল। আমাদের সব জ্ঞাতিগুষ্ঠি, আত্মীয়-কুটুম পরিবারের সকলের শ্বশুর বাড়ির কুটুম—সবাই এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছিল।

শুনলাম, ভাই বিয়ে করতে চলেছে আর তাড়াতাড়ি আমাকে নিতে আসবে। ভাই আমার থেকে ছোটো—মাত্র বারো বছর বয়স। আমার ঠাকমারা ভাইকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এর আগেই আমার খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, যে আমার থেকে মাত্র এক বছরের ছোটো। এবার ভাইও বিয়ে করবে। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছিল; অস্থির হয়ে পড়ছিলাম, কখন ভাই আসবে আমাকে নিয়ে যাবে। মামা একজন ঝি-কে সঙ্গে নিয়ে নৌকো করে এলেন। আমি ওদের সঙ্গে রওনা দিলাম।

বিয়ের আয়োজন শুরু হয়েছে খুব ঘটা করে কিন্তু আমার মনের কষ্টের কথা কাকে বলব! মনে হচ্ছে আমি যেন এদের কেউ না। আমার ভাইয়ের বিয়ে, অথচ আমি নাকি কোনোকিছু ছুঁতে পর্যন্ত পারব না। কেননা আমি বিধবা। আমি যদি বিয়ের কোনো আচার মানতে গেছি, সকলে মিলে 'তুমি সরো, তুমি সরো' বলে একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠত। আমি নিজেকে যতটা পারি গুটিয়ে নিলাম। এজন্যেই খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়েতে ওঁরা আনেননি। ভালো হত, যদি এই বিয়েতেও না নিয়ে আসতেন। প্রতি পদে পদে এত হেলাফেলা, এত অপমান—আমার মন একেবারে ভেঙে গেল। কিন্তু কী আর করব আমি? চুপচাপ এক জায়গায় বসে রইলাম। আমারই শাড়ি-জামা, আমারই গয়না অন্যেরা নিয়ে পরছে, কেউ একবারও আমাকে সাধছে না ওগুলো পরার জন্যে। বিষাদে আমার মন ভরে গেল। অন্য সকলের চাইতে মায়ের ওপরেই আমার রাগ হল সবথেকে বেশি। তিনি যখন জানতেনই, আমি এখানে এরকম ব্যবহারই পাব, তবে কেন তিনি আমাকে এখানে নিয়ে আসলেন। কিন্তু এসব ভাবনা আমার মনের মধ্যেই রেখে দিয়েছিলাম কাউকে কিচ্ছুটি বলিনি।

গোলঘাটার কেশব বসুর মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল মহা ধূমধাম করে, বিপুল আড়ম্বরে। শুনলাম, কনে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে নাকি আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কনে বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সব দুঃখকষ্ট ভুলে গেলাম। নতুন বউয়ের সঙ্গে এক কোণে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। ওর মাথায় এক ঢাল চুল। আমি যখন খুশি ওর চুল খুলে ফের ওর চুল বাঁধতে বসে যেতাম। ওর সিঁথিতে সিঁদুর পড়িয়ে, কপালে সুন্দর একটা টিপ লাগিয়ে আমার মনমতো করে পরিপাটি করে ওকে সাজিয়ে তুলতাম। ওকে সাজানো-গোজানো আমার একটা বড়ো কাজ হয়ে দাঁড়াল। বউভাতের দিন বাবা আমাকে বললেন: 'বউমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে-গুজিয়ে আমার সেরেস্তার বৈঠকখানায় নিয়ে এসো তো। আমার প্রজারা* ওকে আজ দেখতে আসবে।' বাবার কথা মেনে আমি আমার সাধ্যমতো করলাম। বিছানার ওপর একটা সুন্দর ধপধপে দুধ-সাদা চাদর পাতা হল। নতুন বউ আর আমি তার ওপরে গিয়ে বসলাম। দু-পাশে দুটো তামার থালা। তার ওপর ফুল, দুব্বো আর ধান ছড়ানো।

আমার বাবা জড়ো হওয়া প্রজাদের ডেকে বললেন: 'তোমরা যারা আমার বউমার মুখ-দেখার জন্যে যা কিছু উপহার এনেছ, আমার অনুরোধ তার একটা ভাগ আমার বিধবা কন্যার জন্যেও রেখো।' এই নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন। যারা কনের মুখ দেখতে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কনের দিকের থালায় একটাকা আর আমার দিকের থালায় একটাকা রেখে দিলেন। কেউ হয়তো পাঁচটাকা নিয়ে এসেছেন তারা কনের থালায় তিন টাকা আর আমার থালায় দু-টাকা দিল। কনে দেখার এই পর্ব চলল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত, ফের বেলা দুটো থেকে অনেক রাত পর্যন্ত।

বারবাড়িতে রান্না হচ্ছিল। কতজন লোক যে খেয়েছে তা বলা খুব মুশকিল। কেননা মুসলমান প্রজা যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের খাবার রান্না করে নিয়েছিলেন। বহু লোকজনের আনাগোনা, কথাবার্তায় চারদিক যেন গমগম করছিল। কত যে মাছ মাংস দই এসেছিল তার কোনো লেখাজোখা নেই। (চলবে) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

* এখানে প্রজা অর্থ চাষি, যারা জমিদারের অধীনে চাষ করে। কথাটি সেকালের জমিদারি প্রথার সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বকে মনে করিয়ে দেয়।

লেখক অভিধানকার ও প্রাবন্ধিক।

একক মাত্রা Advt.

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

গণেশের মুণ্ডু, কাটা পা অথবা প্লাস্টিকের গল্প . . .

ডা. সৌম্যকান্তি বাগ

ওপরের শিরোনামটা দেখেও পাতাটা উলটে না দিয়ে যে মনোযোগী পাঠক লেখাটা পড়তে শুরু করলেন, তাঁকে প্রথমেই বলি—ঘাবড়াবার কিছু নেই! আসলে যে কারণে এই লেখাটা লিখতে বসা সেই কারণ অথবা ঘটনাগুলি এইরকমই খাপছাড়া, অথচ আমাদের মতো লোকের জীবনে দৈনন্দিন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকটা 'চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের ম'—গোছের শোনাচ্ছে না? আসলে একটা যোগসূত্র কিন্তু আছে। এগুলি হল এমনই কয়েকটি কথা যা ঠিক হোক, বেঠিক হোক—বাজারে 'প্লাস্টিক সার্জারি' বললে যে, দু-চারটে কথা আলটপকা উড়ে আসে এগুলো তারই কয়েকটা। আসুন আধচেনা-জানা বিষয়গুলো নিয়ে দু-চারটে গালগল্প করা যাক।

মিথ নম্বর এক: 'প্লাস্টিক সার্জারি করে হাত, পা, মুণ্ডু সব জুড়ে দেওয়া যায়।' এ ব্যাপারে পথিকৃৎ অবশ্য আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, যিনি বলেছিলেন, প্লাস্টিক সার্জারি ভারতের ঐতিহ্য কারণ পুরাণে তো বলেইছে গণেশের মাথা কাটা যাওয়ার পর বিষ্ণু তার জায়গায় হাতির মাথা প্রতিস্থাপিত করেন। প্লাস্টিক সার্জারির জন্ম সত্যই ভারতে। কিন্তু বিশ্বাস করুন তার সঙ্গে মাথা কেটে জোড়া দেবার কোনো সম্পর্ক নেই। পৃথিবীর প্রথম নথিবদ্ধ প্লাস্টিক সার্জারির কথা পাওয়া যায় ভারতীয় শল্য চিকিৎসার জনক সুশ্রুত-এর লেখায়। কপালের মাংস ও চামড়াকে কাজে লাগিয়ে একটি মহিলার আঘাতপ্রাপ্ত নাক পুনর্নির্মাণ করেন তিনি (৬০০-৭০০ খ্রিস্ট পূর্ব)। ১৭৯৪ সালের কলকাতার জেন্টলম্যান ম্যাগাজিন পত্রিকায় এইরকমই একটি ছবি পাওয়া যায়। ভারতের বাইরে নাক পুনর্নির্মাণের অপারেশনের প্রাচীনতম নিদর্শন ইতালির সার্জেন ত্যাগলিয়াকোজি-র—১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে।

চিত্র ১. সুশ্রুতের প্রথম প্লাস্টিক সার্জারি

কিন্তু মুণ্ডু কি সত্যি জোড়া দেওয়া যায়?—এখনও পর্যন্ত কোনো মানুষের মুণ্ডু প্রতিস্থাপন অর্থাৎ 'Head Transplant' সম্ভব হয়নি। বেশ কিছু বিড়াল কুকুরের ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা চালানো হলেও বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। দুরারোগ্য অসুখে শয্যাশায়ী একজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক এই মুণ্ডু প্রতিস্থাপনের অপারেশন তাঁর ওপর করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। যদিও তা সত্যি সম্ভব কিনা তার উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে।

কয়েকদিন আগে আরেকটি ঘটনাতেও চারদিক খুব তোলপাড় হয়েছে। জনৈক ভদ্রলোকের অ্যাক্সিডেন্টে পা কাটা যাওয়ার পর সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ান বাড়ির লোকজন—সেই পা জোড়া লাগানোর প্রত্যাশায়। শেষপর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি কোনো হাসপাতালেই তা জোড়া লাগানো সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে কোন অঙ্গ জোড়া দেওয়া যায় ও উচিত সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমেই বলে রাখি অঙ্গ জোড়া লাগানো বলতে শুধু অঙ্গটিকে শরীরের সঙ্গে সেলাই করে দিলে হয় না। সেই অঙ্গটির বাঁচার জন্য শিরা ও ধমনির মাইক্রোভাসকুলার সার্জারি করে জোড়া দেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য যে অপারেশন করতে হয় তার দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রবিশেষে ৫-৬ ঘণ্টা থেকে ১২-১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। সেজন্য বিশেষ কিছু পরিকাঠামো (যেমন—অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ, বিশেষ সরু সুতো, যা চুলের থেকেও অনেক অনেক সরু) অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, রোগীর শারীরিক অবস্থাও ১০-১২ ঘণ্টার অপারেশন করার মতো স্থিতিশীল হওয়া প্রয়োজন। তারপরও কয়েকটি বিষয় থাকে যেগুলি এজাতীয় অপারেশনে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিচার করে দেখতে হয়। সাধারণত বোমা ফেটে আঘাত (Blast Injury)। পিষে যাওয়া (Crash Injury)—ইত্যাদির ক্ষেত্রে অঙ্গ জোড়ার অপারেশন বা Reimplantation—এর সাফল্যের

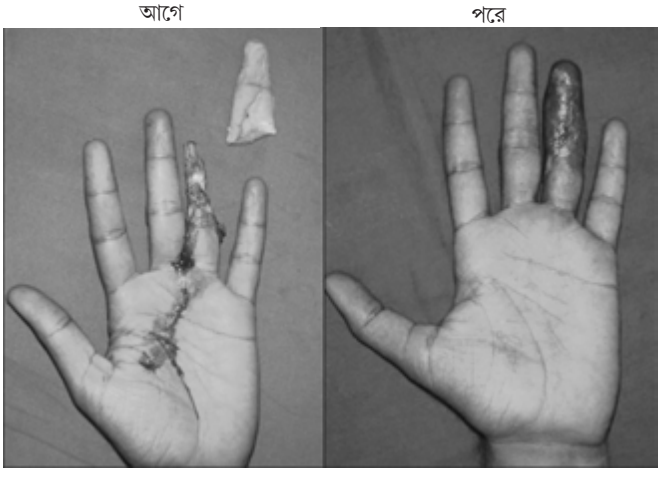

চিত্র ২. অঙ্গ জোড়ার অপারেশন

হার অত্যন্ত কম। উপরন্তু Reimplantation-এর পর অঙ্গটি কতটা কার্যকরী থাকবে তা নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের ওপর যার একটি হল স্নায়ুর কার্যক্ষমতা ফিরে আসা। পায়ের ক্ষেত্রে স্নায়ুর কার্যক্ষমতা এবং সংবেদন ফিরে আসতে অনেক বেশি সময় লাগে এবং ফিরে না এলে সেই পা নিয়ে চলাফেরা করতে গেলে চোট-আঘাতের সম্ভবনা প্রচুর বেশি। তুলনায় যান্ত্রিক পা লাগিয়ে অনেক সহজে হাঁটাচলা করা যায়। তাই পায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত Reimplantation করা হয় না। একটি বিষয় মাথায় রাখতে হয় তা হল সময়। আঘাত লাগার পর একটা সময়ের মধ্যেই এই জাতীয় অপারেশন করা যায়। তারপর নয়। এটা পায়ের ক্ষেত্রে মাত্র ৩-৪ ঘণ্টা। হাতের ক্ষেত্রে (কবজি বা তার উপরে) ৬-৮ ঘণ্টা। কিছু ক্ষেত্রে যেখানে কাটা অঙ্গে মাংসের পরিমাণ কম (যেমন—আঙুল) সেখানে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত জোড়া লাগানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। এই সময়টুকুও কাটা অঙ্গটিকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সবচেয়ে ভালো হয় কাটা অঙ্গটিকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে একটি প্লাসটিকের ব্যাগে মুড়ে চারদিক বরফকুচি দিয়ে ঘিরে একটি প্লাস্টিকের জার বা কৌটোয় করে নিয়ে আসতে পারলে। সে ব্যবস্থা না থাকলেও নিয়ে আসা যেতে পারে। তবে তাতে Reimplantation করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে প্লাস্টিক সার্জেনের পরামর্শ মেনে চলাই ভালো, নিজেরাই সে ব্যাপারে কী করতে হবে সে দাবি নিয়ে চিকিৎসকের কাছে এলে তা রোগীর জন্য ভালো হবে না।

অনেকক্ষেত্রে আমাদের এটাও ভাবতে হয় Reimplantation করা আদৌ রোগীর জন্য লাভজনক কিনা। বহুক্ষেত্রে (যেমন—আঙুলের একেবারে ডগার দিক অর্থাৎ আঙুলের শেষ করটিরও ওপর) Reimplantation কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে কারণ শিরা ধমনিগুলি এতই সরু হয়ে যায় যে জোড়া লাগাতে গেলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুতো ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোস্কোপ এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্লাস্টিক-সার্জন প্রয়োজন হয় যা খুবই অপ্রতুল। তুলনায় এইসব ক্ষেত্রে আঙুলের দৈর্ঘ্য বজায় রেখে অন্যরকম প্লাস্টিক সার্জারি (ফ্ল্যাপ সার্জারি/স্কিন গ্রাফট) করে রোগীর আঙুলের প্রায় একইরকম কাজ ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

মিথ নম্বর দুই: 'প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা সব বদলে দেওয়া যায়।'—এই মিথের জনক অবশ্য আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতারা। সিনেমার পর্দায় আমরা কতবারই দেখেছি অমিতাভ বচ্চন প্লাস্টিক সার্জারি করে মিঠুন চক্রবর্তী হয়ে ফিরে এলেন। এখন সিরিয়াল নির্মাতারা আরও কয়েককাঠি ওপরে। তাঁদের কোনো অভিনেতা/নেত্রীর সঙ্গে চুক্তি ফুরিয়ে গেলেই তাঁরা সেই চরিত্রের একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটান—যার পর হয় প্লাস্টিক সার্জারি—প্রবেশ ঘটে নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীর!! আশ্চর্য হল কোনো ক্ষেত্রেই তাঁদের মুখে কোনো সেলাইয়ের দাগ থাকে না।

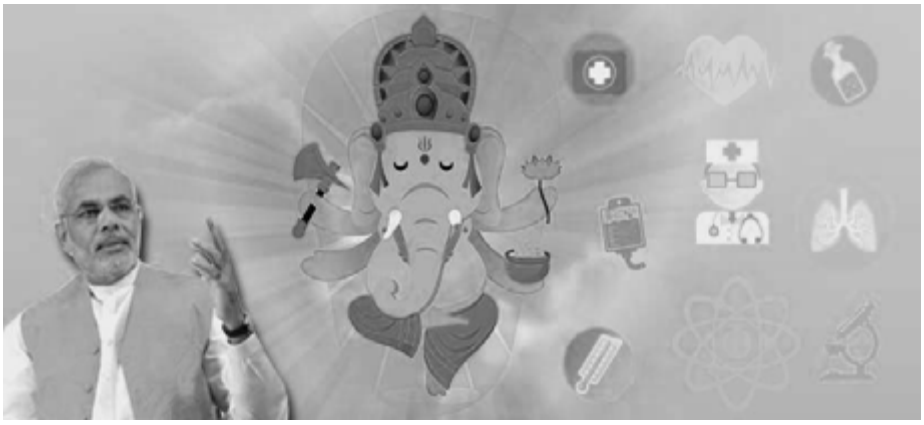

চিত্র ৩. মোদীর মিথ—গণেশের কাটা মুণ্ডু

আসলে কিন্তু মুখ বদলানোটা মোটেই মুখোশ বদলানোর মতো নয়। প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখ সম্পূর্ণ বদলানোর নাম হল Face Transplantation। ঘটনা হল, সেই অপারেশনটি আজ পর্যন্ত ভারতে একটিও করা সম্ভব হয়নি। সারা পৃথিবীতে এ অপারেশ সফলভাবে হয়েছে হাতে গোনা। তাও সেগুলি গত বছরের মধ্যেই। আর যার তার মুখ এইভাবে বদলানো হয়ও না। দুরারোগ্যব্যাধি (যেমন ভাস্কুলার ম্যালফর্মেশান) অথবা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে মুখ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেলে তবেই এই অপারেশনের কথা ভাবা যায়। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও দির্ঘ এই অপারেশনে এক মৃত ব্যক্তির মুখ লাগানো হয়। যেকোনো ট্রান্সপ্লান্টের মতো এখানেও সারাজীবন কিছু ওষুধ (স্টেরয়েড ও অন্যান্য প্রতিরোধক্ষমতানিরোধী বা immunosuppressant) খেতে হয়। যাদের মারাত্মক পার্শ্বক্রিয়া রয়েছে। সর্বোপরি—পরে সেই 'নতুন মুখ' নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও (graft rejection) থাকে। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের দেশে কোচির একটি হাসপাতালে দু-বছর আগে প্রথম সফল হাত প্রতিস্থাপন (Hand Transplantation) সম্ভব হয়েছে। সেই হাতের অধিকারী এখনও পর্যন্ত তাঁর নতুন হাত দিয়ে অনেক কাজও করতে পারছেন। তবে, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অ্যাক্সিডেন্টে দু-হাতই কাটা পড়েছে এমন রোগী ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে এমন ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন করা হয় না।

মিথ নম্বর তিন: 'প্লাস্টিক সার্জারি মানে কোনো সেলাই লাগে না।'—সবচেয়ে ভয়ংকর মিথ! সেদিন আউটডোরের কথাই ধরুন। একটি বছর পঁচিশের ছেলে এসেছিল যার ছোটোবেলায় আগুনে পুড়ে হাতের আঙুলগুলো বেঁকে গেছে। ছেলেটিকে পরীক্ষা করে বললাম, 'তোমার আঙুলগুলো সোজা করা যাবে তবে অন্য জায়গা থেকে মাংস বা চামড়া নিয়ে লাগাতে হবে।' ছেলেটি প্রশ্ন করল—ডাক্তারবাবু সেলাই পড়বে? স্বভাবতই বললাম, হ্যাঁ। শুনে ছেলেটি বলল 'না না

আমি প্লাস্টিক সার্জারি করাতে চাই।' তাকে যতই বোঝাই না কেন যে অপারেশনটা করা হবে সেটা প্লাস্টিক সার্জারিই, সে কিছুতেই মানতে নারাজ। অনেকে আবার আরও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতে আমাদের অনুরোধও করেন সেলাই না করে যেন 'প্লাস্টিক' দিয়ে অপারেশনটা করে দেওয়া হয়। আসলে কিন্তু প্লাস্টিক সার্জারির সঙ্গে 'প্লাস্টিক' নামক বস্তুটির কোনো সম্পর্ক নেই। 'Plastic' কথাটার মানে নমনীয়। শরীরের নমনীয় বা নরম কলা (soft tissue) দিয়ে এই অপারেশন করা হয় তাই এর নাম প্লাস্টিক সার্জারি। সার্জারির অন্য সব বিষয়ের মতোই এখানেও সেলাই-ফোঁড়াই থাকবেই। পার্থক্য এইটুকুই যে প্লাস্টিক সার্জারির বেশ কিছু অপারেশনে (বিশেষত Cosmetic সার্জারি) এমনভাবে সেলাই দেওয়া হয় যে সেলাই-এর দাগ সহজে বোঝা যায় না।

তাহলে 'চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের ম' মিলে কী দাঁড়াল?—দাঁড়াল এটাই যে প্লাস্টিক সার্জারি হল 'soft tissue'-র বা শরীরের নরম ও নমনীয় কলার সার্জারি। এর মধ্যে চামড়া, মাংসপেশি, শিরা, ধমনি, স্নায়ু এমনকী কখনো হাড়ও পড়তে পারে। মূলত শরীরেরই বিভিন্ন অংশের পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণেও কখনো কখনো প্রতিস্থাপন—এই নিয়েই প্লাস্টিক সার্জারি। শল্য চিকিৎসার এই বিভাগটির মধ্যেও অনেকগুলি বিভাগ আছে। যেমন—রিকনস্ট্রাক্টিভ প্লাস্টিক সার্জারি (অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গের পুনর্গঠন) ও কসমেটিক প্লাস্টিক সার্জারি (শারীরিক সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য অপারেশন)। পুড়ে যাওয়া, অ্যাক্সিডেন্ট বা চোট-আঘাতজনিত সমস্যায় চোটগ্রস্ত অঙ্গের পুনর্গঠন, ক্যান্সার জাতীয় রোগে ক্যান্সার সার্জারির পর অঙ্গটির পুনর্গঠন, জন্মগত অনেক রোগের (যেমন—ক্লেফট লিপ, ক্লেফট প্যালেট ইত্যাদি) ক্ষেত্রে অঙ্গগুলির পুনর্নির্মাণ প্রথম বিভাগের অন্তর্গত। অন্যদিকে, শরীরের চর্বি কমানো বা বাড়ানো (লাইপোসাকশন বা লাইপোফিলিং)। নাকের আকার বদলানো (রাইনোপ্লাস্টি), টাক পড়া মাথায় চুল গজানো—ইত্যাদি অপারেশনগুলি দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিভাগে অপারেশন ছাড়াও লেসার সার্জারি, বোটক্স ইঞ্জেকশন ইত্যাদি নানা চিকিৎসা পদ্ধতিও অন্তর্গত। অবশ্য এই বিভাগগুলির সীমারেখা খুব সুস্পষ্ট নয়। বহুক্ষেত্রেই দু-ধরনের অপারেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। প্লাস্টিক সার্জারির অপারেশন পদ্ধতি অন্যান্য নানা সার্জারির বিভাগের অপারেশনের সঙ্গেও করার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি (Sexual Re-assignment Surgery)-র ক্ষেত্রেও প্লাস্টিক সার্জারির বিভিন্ন অপারেশন প্রয়োগ হয়। পরে কখনো সুযোগ পাওয়া গেলে এই বিভিন্ন বিভাগের কথা আলোচনা করা যাবে। আপাতত 'প্লাস্টিকের গল্প' এখানেই ইতি। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সৌম্যকান্তি বাগ, এমবিবিএস, এমএস, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্লাস্টিক সার্জারিতে ডি এম করছেন।

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিউ

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজ স্ট্রিট, কফিহাউস (তৃতীয় তল), কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

অতৃপ্তির ঘুমের অথবা মামুলি দ্বিপ্রাহরিক তন্দ্রার রোগ

অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বা “ওএসএ” (ঘুমের মাঝে শ্বাসরোধ হওয়ার রোগ)

এই রোগ সাধারণত রোগীরা নিজেরা ধরতে পারেন না। রাতে ভালো ঘুম হয় না। কেন যে হয় না, তাও বোঝেন না। দিনে এলিয়ে পড়েন। কাজে ভুল হয়ে যায়, উদ্যম ফুরিয়ে যায়। রাতে কেন যে নাক ডাকেন, নিজে টের পান না—পাশে শুয়ে থাকা মানুষটির অমন বিকট নাক-ডাকার জেরে ঘুম ভেঙে যায়। অন্য কোনো রোগের জন্য দেখাতে এসে হয়তো কথায় কথায় ডাক্তারের কাছে বেরিয়ে পড়ে সে-কথা। তখনই ডাক্তার নিশ্চিত হন রোগী অন্য রোগের সঙ্গে ‘অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া’য় ভুগছেন। সে রোগেরই সাতকাহন ফিরিস্তি দিয়েছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী।**

সুতনু এমবিএ ক্লিয়ার করেই পছন্দমতো চাকরি পেয়ে গেল। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছেলে। এবারে সংসারের হাল ধরবে। মেধা আর অধ্যবসায়ের জোরে বাবা আর মায়ের স্বপ্নপূরণ করবে কৃতি সুতনু। সুপাত্রী দেখে বিয়েটাও সেরে ফেলা গেল। সুতনুর এবারে একটু-আধটু বিলাসিতায় সখ হল। অনেক সাধ-আহ্লাদ পুষে রেখেছিল এই সময়ের জন্যই তো! কর্পোরেট জগৎ সুতনুকে লুফে নিল। বহুজাতিক সংস্থার এয়ার কন্ডিশন সেডান গাড়ি, অফিসে লাঞ্চ টাইমে হালফ্যাশানের রেস্তরাঁর পিৎজা আর আপন মর্জিমাফিক গরম-ঠান্ডা পানীয় সুতনুর মেধার বাণিজ্যায়নে লেগে গেল। মেধা নিংড়ে নেওয়ার এই কারবারে সুতনুর অল্প মেধার কাজে (যেমন পাশের টেবিল থেকে কোনো ফাইল নিয়ে আসা বা অফিসের ক্যান্টিনে গিয়ে চা খেয়ে আসা ইত্যাদি) সময় নষ্ট হওয়ায় কোম্পানির বিশাল ক্ষতি। তাই সুতনুর হাতের নাগালে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের নয়া সংস্করণ তথা কলিং বেল। কলিং বেলের টুং-টাং-এ ফাইফরমাশ খাটার জন্য হাজির হয়ে যায় ইউনিফর্ম পরিহিত চাপরাশি। লিকলিকে চেহারার সুতনু চাকরি পাবার ছ-মাসের মধ্যেই টলিউডের হিরো বনে গেল। টলিউডের হিরোদের গায়েগতরে বাড়া-কমা দেখভাল করার জন্য পয়সা দিয়ে শরীরচর্চা করার মাস্টার ও খাবার মাপজোক করার জন্যে খাদ্যবিশারদ (ডায়েটিশিয়ান) পোষা হয়ে থাকে। সুতনুদের জন্যে এ সব থাকে না।

সে যাই হোক, পরিশ্রমী ছেলে সুতনু সহজেই কাজের ছেলে হিসাবে ম্যানেজমেন্টের নেক নজরে এসে গেল। বছর ঘুরে গেল। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে সুতনু তরতরিয়ে উঠে যেতে লাগল। কিন্তু আজকাল মাঝেমধ্যে ম্যানেজমেন্টের মিটিং-এ সুতনু সব আলোচনায় আগের মতো অংশ নিতে পারে না সেই প্রথম দিককার সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে। সেই আগের মতো তারুণ্য আর উদ্যমের একটা অভাব সুতনু নিজেই বুঝতে পারে। মিটিং-এর মধ্যে সুতনু হঠাৎ হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। সুতনুর ছিপছিপে চেহারায় একটা ভারিক্কি ভাব এসেছে। সুতনুর বউ বলে, রাতে ঘুমের মাঝে ও নাকি নাক ডাকে আজকাল। অফিসের বস সুতনুকে “এ” থেকে “জেড” পর্যন্ত ভিটামিন আর কৌটায় পোরা প্রোটিন-গুঁড়ো খাবার পরামর্শ দিলেন। যেখানে সেখানে যখন তখন সুতনু আজকাল ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে বিছানায় শোয়া মাত্রই সুতনু এক নিমেষে মরণ কাঠির স্পর্শে পৌঁছে যায় ঘুমপুরীতে। রোমান্সের বদলে নাসিকা গর্জনের মূর্ছনায় সুতনুর নববধূ বিনিদ্র রাত যাপন করে। যৌবনের সদ্য বিবাহিত জীবনের রাতগুলো সুতনুর কাছে বিড়ম্বনা হয়ে দেখা দেয়। এসব আর কাকেই বা বলা যায়! কিছুটা শুনে পাড়ার ওষুধের দোকানের প্রবীণ কর্মচারী চশমার ফাঁক দিয়ে সুতনুকে দেখে প্যাকেটে পুরে প্লাস মার্কা একগাদা ক্যাপসুল দিলেন। সুতনুর বয়স তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে লাগল।

বুদ্ধিমান আর সচেতন সুতনু দেরি না করে ডাক্তার দেখাবে সিদ্ধান্ত নিল। তা কোন ডাক্তারের শরণাপন্ন হবে সুতনু? আকাশচুম্বী টাওয়ার সর্বস্ব আধুনিক যুগের সচ্ছল মানুষের আস্তানার কাছেপিঠে জেনারেল ফিজিশিয়ান বা পারিবারিক ডাক্তাররা বিরাজ করেন না। ভরসা কর্পোরেট হাসপাতালের ডাক্তার। তেনাদের সবাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। ডাক্তার বাছাইয়ের কাজটা আজকাল নিজেকেই করে নিতে হয়। সুতনুর কপাল ভালো। এই ডাক্তার আর ওই ডাক্তার এই সব প্রাথমিক ঠোক্কর খাওয়ার কাজটা এড়াতে সাহায্য করলেন অফিসের মেডিক্যাল অফিসার। সুতনু পৌঁছে গেল একজন পালমোনোজিস্ট বা বক্ষ-বিশারদের কাছে। ঘুমকাতুরে রোগের কারণ নাকি শ্বসন যন্ত্রের গোলযোগে খুঁজে পাওয়া যাবে। এমনটাই অফিসের মেডিক্যাল অফিসারও অনুমান করেছেন।

বিস্তর ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষা হয়ে গেল। একটু-আধটু হাই

প্রেশার, কিঞ্চিৎ সুগার আর কোলেস্টেরলের লেবেল লেগে গেল সুতনুর তনুতে। অফিসের বস মুচকি হেসে বললেন এইবার জাতে উঠেছ। ডাক্তার বললেন আসল পরীক্ষা বাকি আছে। "স্লিপ স্টাডি" বা ঘুমের পরীক্ষা করব এবার। একরাত পরীক্ষাগারে ঘুমাতে হবে। এই পরীক্ষাটার গালভরা নাম "পলিসোম্নোগ্রাফি"। শিশুর মতো অবাক বিস্ময়ে হতবাক সুতনু মহাকাশযানের অন্দরমহল-সদৃশ পরীক্ষাগারের

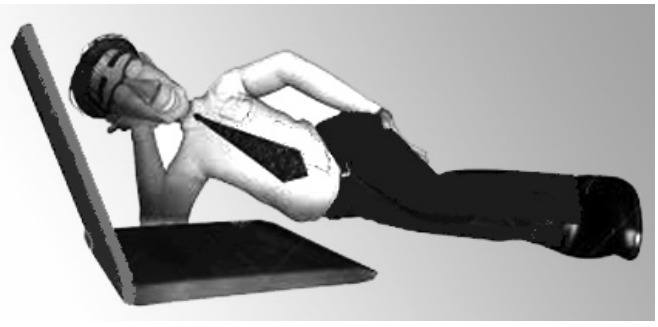

বিছানায় একরাতে ঘুমোতে গেল। নাকে, বুকে, আঙুলে আর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যন্ত্রের তার লাগিয়ে সুতনু ঘুমিয়ে পড়ল। রাতজাগা যন্ত্র সারারাতের শ্বাসের ওঠা নামা ও ছন্দ, আঙুলের রক্তনালীর অক্সিজেনের মাত্রা, নাকের ফুটোয় বাতাসের চাপ, হৃদ্‌স্পন্দনের অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি হরেক রকমের মাপজোক লিপিবদ্ধ করে নিল। পাশের ঘরে আড়ালে থেকে ঘুমের মধ্যের নাক ডাকার শব্দ, হাত-পা ছোড়াছুড়ির ঘটনা, চোখের পাতার ওঠানামা ভিডিয়ো আর অডিয়ো রেকর্ডিং করে নিলেন যন্ত্রচালক। সুতনুর নিদ্রাকালীন গোপন আর একান্ত ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো এই পরীক্ষায়ই ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়ে গেল রোগটাও। রোগের নাম, "অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া" বা ওএসএ। ঘুমের মধ্যে শ্বাসনালীর উপরের অংশ, অর্থাৎ গলনালী (পরিভাষায় ওরোফ্যারিংস) বন্ধ হয়ে যাবার রোগ। না, ফুসফুসের হাঁপানি রোগ বা হার্টের রোগ নয়। শ্বাসনালীর উপরের প্রান্তের গলার অংশের চুপসে বন্ধ হয়ে যাওয়ার রোগ। এই সমস্যা ঘুমের মধ্যে হয়।

ডাক্তার বললেন, এই রোগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আসে হাই প্রেশার, সুগার, হার্টের রোগ ইত্যাদি প্রভৃতি। সেসব ওষুধে সামলানো যাবে। সাধ্যমত অর্থদণ্ডে মিলবে কিঞ্চিৎ রোগোপশম। কিন্তু অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। ওজন কমান, নইলে শ্বাস নেবার যন্ত্র নাকে লাগিয়ে ঘুমাতে হবে। যন্ত্রের নাম "সি-প্যাপ" বা "কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার" মেশিন; বিদ্যুতে চলে। সুতনুর চোখ কপালে। সে বলে, সেকি? এত কাণ্ড হয়ে গেল আর কিচ্ছুটি টের পেলাম না? আপনি আমার এই মামুলি দ্বিপ্রাহরিক তন্দ্রার রোগের এই ঠিকানা বার করলেন? খামোকা ভয় দেখাচ্ছেন কেন? ডাক্তার বুঝলেন, এইখানে রোগের ভয়াবহতার সঠিক চিত্র তুলে না ধরতে পারলে রোগী ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে গিয়ে পিৎজা সহযোগে ক্রিমওয়ালা কফি খাবেন আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘুমকাতুরে রোগের ভাবনাটা উড়িয়ে দেবেন। বললেন, সুতনুবাবু, মিনিট পনেরো সময় আছে? বাজে খরচ করার মতো বৃথা সময় আমার বেশ কম। আমি আপনার বোঝার মতো করে এই রোগ সম্বন্ধে বলছি। বুঝতে অসুবিধা হলে প্রশ্ন করবেন। আপনার দেওয়া পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই সময়টা আপনার প্রাপ্য। ওষুধ তো দিতে পারব না, তাই এই জ্ঞান দেওয়া ছাড়া আর আমার কিছুই দেবার নেই। আপনি যে রোগে ভুগছেন, সে রোগে এই তথ্যগুলিই যদি কাজে লাগাতে পারেন, তবেই, কেবলমাত্র তবেই রোগমুক্তির আশা আছে। সুতনু বলে, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, বলুন। চিকিৎসার সবচেয়ে কার্যকর অংশ হল রোগীর সচেতনতা নির্মাণ। ডাক্তার সেই উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন . . .

আসলে মেদবৃদ্ধি দিয়ে এই রোগের যাত্রা শুরু। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, রোগাদের এই রোগ হতে পারে না। স্থূলতার প্রকোপের সঙ্গে এই রোগের সহাবস্থান বেশ চোখে পড়ার মতো। আমেরিকার জনগণের স্থূলতা আমাদের দেশের থেকে বেশি বলে ও দেশে প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ থেকে ৬০ বৎসর) পুরুষের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব শতকরা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। মহিলাদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। আমাদের দেশে তার চেয়ে কিছু হয়তো বা কম হবে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দুটো শারীরিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—১. স্থূলতা, অর্থাৎ দেহভর (বডি মাস ইনডেক্স) প্রতি বর্গমিটারে ৩০ কিলোগ্রাম বা তার বেশি এবং ২. গলনালী (ওরোফ্যারিংস) বা শ্বাসের হাওয়া ঢোকা ও বেরোনোর উপরের অংশটা অপেক্ষাকৃত সরু হওয়া ও অল্প জায়গায় ভিড় করে থাকা। মানুষের গলার মধ্যে মুখ-গহ্বর ও নাকের পেছনে যে অংশটি থাকে সেখানে একটি মাত্র নালী পর্যায়ক্রমে খাবার আর শ্বাসের হাওয়া বয়ে নিয়ে যায়। শ্বাসনালীর উপরের অংশের শব্দ সৃষ্টিকারী অঙ্গ বা ল্যারিংস খাবার গেলার সময়ে শ্বাসনালীকে বন্ধ করে রাখে, সেটা না হলে খাবার সময় আমাদের শ্বাসনালীতে খাবার ঢুকে যেত। মেদবৃদ্ধির ফলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সঙ্গে গলনালীর চারধারে চর্বির বোঝা বাড়তে থাকে ও মাংসপেশির টান কমতে থাকে। এটা আমাদের জানা আছে, ঘুমানোর সময়ে আমাদের মাংসপেশিও বিশ্রাম নেয়, তার অন্তর্নিহিত টান (মাসল টোন) কমে যায়। আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যায়। এর ফলে বিশেষ করে চিৎ হয়ে ঘুমানোর সময়ে চর্বির ভার সামলে শ্বাসনালীর উপরের অংশটিকে হাওয়া চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখা, গলনালীর দেওয়ালের মাংসপেশির পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে শ্বাস টানার যথাযথ মস্তিষ্কের নির্দেশ থাকলেও, বুকের খাঁচা সুস্থ সমর্থ থাকলেও কেবল শ্বাসনালীর উপরের অংশ চুপসে যাওয়ার কারণে শ্বাস নেবার প্রক্রিয়া বাধা পায়। শ্বাস নেবার চেষ্টা চলে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া চুপসে যাওয়া শ্বাসনালী দিয়ে ঢুকতে পারে না। ফলে কিছুক্ষণ পরে পরে শ্বাস চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায় আর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে গেলে জেগে যাওয়ার পরে অথবা উঠে বসার পরে গলনালীর দেওয়ালের মাংসপেশি জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক টান ফেরত পাওয়ার ফলে ক্ষণিকের জন্য চুপসে যাওয়া গলনালী পুনরায় আংশিক উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই সময় রোগী ঘন ঘন শ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ আগের শ্বাস না নিতে পারার অভাব পূরণ করার চেষ্টা করে। ওই সময় সরু হয়ে যাওয়া গলনালী যথেষ্ট বাধাহীন

থাকে না বলে আগের মুহূর্তের অক্সিজেনের অভাব (এবং রক্তে জমে যাওয়া কার্বনডাইঅক্সাইডের আধিক্যের জন্যও) পূরণের জন্যে ঘড় ঘড় শব্দে বড়ো বড়ো ও ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে রোগী। অনেক সময় ঘুমে আচ্ছন্ন রোগীর সে মুহূর্তের কথা পরের দিন মনে নাও থাকতে পারে। শ্বাসরোধ হয়ে যাওয়া আতঙ্কের সেই শব্দে পাশে শুয়ে থাকা মানুষটির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। শয্যাসঙ্গীর/সঙ্গিনীর সেই বিবরণ এই রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। সারা রাত ধরে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে এমন ধারা অতৃপ্ত ঘুমের চেষ্টা। ঘুমানো মাত্রই গলনালীর মাংসপেশির টান কমে গিয়ে শ্বাসরোধ হওয়া আর পরমুহূর্তে জেগে গিয়ে ঘন ঘন ঘড় ঘড় নাক ডাকার শব্দে গভীর শ্বাস নেবার ঘটনা ঘটতে থাকে সারারাত ধরে। এই শ্বাসরোধ হবার ঘটনাগুলোকে পরিভাষায় 'অ্যাপনিয়া' (apnea) বলে। অ্যাপনিয়ার আগের কম কার্যকরী শ্বাস নেবার ঘটনা হল "হাইপোঅ্যাপনিয়া" (hypopnea)। রোগের মাত্রার সঙ্গে "অ্যাপনিয়া" আর "হাইপোঅ্যাপনিয়া"-র হারের (apnea-hypopnea index, AHI) একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। প্রতি ঘণ্টায় "অ্যাপনিয়া-হাইপারঅ্যাপনিয়া"-র মাত্রা পাঁচের বেশি হলে অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগ নির্ণয় করা যাবে। সন্দেহজনক রুগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য যে পরীক্ষার দ্বারা চিকিৎসকরা এটা নিশ্চিত করে থাকেন তার নাম "স্লিপ স্টাডি" বা "পলিসোম্নোগ্রাফি"।

ঘুমকাতুরের দিনলিপি

শ্বাসকষ্টের জন্য রাতে বারংবার ঘুম ভেঙে যায়। হয়তো ঘুম ভাঙাটা খুব কম সময়ের জন্য হয়, এতই কম সময়ের জন্য যে পরদিন রোগীর সে কথা মনেই থাকে না। কিন্তু ওই ভাঙা-ভাঙা ঘুম দিনের ক্লান্তি দূর করতে পারে না। রাতে যে ঘুমটুকু হয় না (sleep debt) তা দিনের কর্মব্যস্ত সময়ের উপরে চেপে বসে। রাতের অতৃপ্তি দিনের মেজাজ বিগড়ে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেমক্কা ভুল হয়ে যায়। কাজের মধ্যে বেঠিক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ার জন্য অপ্রস্তুত হয়ে যেতে হয়। গাড়ি চালানোর সময় অ্যাক্সিডেন্ট হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দিনের বেলা যেখানে সেখানে নাক ডেকে বা না ডেকে ঘুমিয়ে পড়ার বদনাম জোটে।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই রোগের সঙ্গে নাক ডাকার সম্পর্কটা কী? নাক অবশ্য এই রোগে না ভুগলেও ডাকে। তবে এই রোগে আক্রান্ত প্রায় ১০০ শতাংশ ব্যক্তিই নাক ডাকেন। নাক ডাকার সঙ্গে নাকের মধ্যেকার পর্দার বেঁকে যাওয়ার ঘটনার একটা গুজব আছে। সেটা গুজবই, কারণ নাকের পর্দা জ্যামিতি মাপজোক মেনে একদম মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকে এমনটা বড়ো একটা দেখা যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পেশি কমজোরি হতেই থাকে। মুখমণ্ডল ও নাকের চারপাশের দেওয়ালের পেশিও কম বয়সের টান টান ভাব হারায়। নাকের মধ্যের ছোটো ছোটো কুঠুরিগুলো (সাইনাস) দৃঢ়তা হারায়। শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কালে হাওয়ার তোড়ে আন্দোলিত হতে থাকে নাকের ও সাইনাসের দেওয়াল। নিজস্ব কম্পাঙ্কের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক এক জনের নাক নিজস্ব সুর, তাল ও ছন্দ নিয়ে অনুরণিত হতে থাকে। এর সঙ্গে সাইনাসের প্রকোষ্ঠগুলো সঙ্গত দিয়ে গলার আওয়াজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মতো অনুকরণের অযোগ্য শব্দের আবহ সৃষ্টি করে। অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগে শরীরের অন্য অংশের তুলনায় মাথা আর মুখমণ্ডলের মাপের ও আকারের বৈষম্যের জন্য (cranio-facial crowding) ও মেদবৃদ্ধির জন্য ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ অবস্থা থেকে জেগে ওঠার কালে ঘন ঘন ও লম্বা শ্বাস নেবার সময় আতঙ্ক সৃষ্টিকারী নাক ডাকার শব্দ হওয়াটা একরকম ধরাবাঁধা। অন্যান্য ব্যক্তিরা সাধারণত একনাগাড়ে নাক ডাকেন। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা একটি নির্দিষ্ট সময় পরে পরে সেটা করেন বলে এই বিশেষ রকমের নাকের শব্দ রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই নাক ডাকা যে স্বাভাবিক নয়, সেটা যে প্রথমবার শুনছেন, তিনিও অনুমান করতে পারেন।

সুতনুর মতোই এই রোগে ভোগা ব্যক্তিরা অবশ্য নাক ডাকার জন্য অথবা দিনের বেলায় যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য ডাক্তার দেখাতে যান না। অন্য কোনো কারণে ডাক্তারে দেখালে গেলে হেঁ হেঁ হাসি হেসে একদম শেষ পর্বে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোনোর সময় হালকাভাবে রুগীর সঙ্গী মানুষটি বলেন, 'জানেন তো ডাক্তারবাবু, উনি না রাতে কেমন নাক ডাকেন, আমার বেশ ভয়ই লাগে। আমার ঘুম ভেঙে যায়। কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখি। পরে সাহস করে (!) ডেকে দিই এটা নিশ্চিত করার জন্য . . . উনি . . . মানে . . .।' কথাটা উহ্য থাকার জন্য ঠোঁটকাঁটা ডাক্তার বলেন, 'উনি বেঁচে আছেন কিনা এটা পরখ করার জন্য তো?' সুতনুর সহধর্মিণী শশব্যস্ত হয়ে বলেন, '. . . কী বললেন সেটা না বোঝার মতো হলেও, বলা হয়ে যায়।' ডাক্তার বলেন, তেমন ভাবার কোনো কারণ নেই। ওই শ্বাস না নিতে পারার জন্যই ওনার ঘুম ভেঙে যাবে, আর ঘুম ভেঙে গেলেই শ্বাসের ঘাটতি পূরণ করার জন্য উনি সুদে আসলে সশব্দে শ্বাস নিয়ে নেবেন। এই রোগে শ্বাসরোধ হয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে অনেকে হাঁপানি রোগের ওষুধ প্রয়োগ করার ভুল করতে পারেন। তাতে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা বেশি। ভয়টা অন্য কারণে। সুতনুর গিন্নি ভয়ার্ত চোখে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইলেন, মুখে প্রশ্ন চিহ্ন। 'এই অবস্থায় শ্বাসকষ্ট কমানোর প্রচলিত হাঁপানির ওষুধ প্রয়োগ কিন্তু যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ' অভিজ্ঞ ডাক্তার মনে করিয়ে দিলেন। 'এই শ্বাস কষ্ট তো আর বুকের মধ্যেকার শ্বাসনালীর নয়! এই কথাটা স্মরণে রাখবেন কিন্তু।' '—তবে এই কষ্ট কমবে কী ওষুধে?' সুতনুর আকুল প্রশ্ন। ডাক্তার বললেন, 'এ রোগের কোনো ওষুধই নেই। ওজন কমাতে না পারলে বাকি অর্ধেক জীবন, মানে আপনার অবশিষ্ট আয়ুর ঘুমের সময়টায়, ঘুমানোর জন্য নাকে-মুখে হাওয়া পাম্পের মেশিন লাগিয়ে ঘুমোতে যেতে হবে। ইলেকট্রিকে চলে, যার ইংরেজি নাম, কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার বা "সিপিএপি", অথবা চলতি ভাষায় "সিপ্যাপ"। এটা মুখোশের দ্বারা নাকে-মুখে হাওয়ার চাপ বাড়িয়ে রেখে গলনালীকে চুপসে যেতে বাধা দেয়। রোগী আরামে ঘুমোতে পারে। সকালে ঘুম ভাঙার পরে তরতাজা থাকে। আর হ্যাঁ, বিকট নাক ডাকা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

সুতনুর এবারে ভয়ার্ত প্রশ্ন, 'স্যার, তবে ভয়টা কীসের?' ওই যে

বললেন, 'ভয়টা অন্য কারণে।' ডাক্তার বলতে থাকলেন, অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগে সমস্যা দু-রকমের। প্রথম ধরনটায় কষ্টগুলো প্রাণে মারে না, ভোগায়। রাতের ঘুম তৃপ্তিদায়ক না হবার জন্য দিনের কাজে মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে। মাথাব্যথা হয় আর মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। মনে রাখার ক্ষমতা ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা কমে যায়। এমনকী সঙ্গমের ইচ্ছা ও ক্ষমতা কমে যাওয়ার সঙ্গে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও কমে যেতে পারে। দেখা গেছে যে, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, পলিসিস্টিক ওভারির রোগ, মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব, নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজ়িজ় ইত্যাদি অনিরাময়যোগ্য ক্রনিক রোগের প্রবণতা অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। তবে এগুলোও যতই ভয়াবহ হোক, আমাদের হয়তো ততটা ভাবায় না, যতটা হঠাৎ মৃত্যুর ভয় আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগে হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনাও থাকে।

এমন বোমা বিস্ফোরণকারী কথা শুনে কারোর পক্ষেই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা সম্ভবপর হয় না। সুতনু আর তার স্ত্রী সোজা হয়ে বসলেন। ডাক্তার বললেন, যদিও বিরল, তবুও রাতে ওই চরম শ্বাসরোধের (অ্যাপনিয়া) মুহূর্তগুলিতে রক্তে (ফলে হৃদ্‌পিণ্ডেও) অক্সিজেনের অভাবে ও (সিম্প্যাথেটিক) স্নায়ুর উত্তেজনার প্রভাবে হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ভেন্ট্রিক্যুলার টাকিকার্ডিয়া ও ফিব্রিলেশন হল হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনের তেমন কিছু গোলযোগ, যাতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে। এইটা দ্বিতীয় ধরনের ভয়।

'তবে কী হবে উপায়?' সুতনুর ব্যাকুল প্রশ্ন। ডাক্তার বললেন, প্রথম কাজ হল সমস্যাটা যে আছে এটা ঠিকভাবে নিশ্চিত করা। তারপর রোগের তীব্রতার পরিমাপ করা দরকার। এটার জন্য "ঘুমের মানের পরীক্ষা" বা "স্লিপ স্টাডি" করতে হবে। এর গাল ভরা নাম পলিসোম্নোগ্রাফি। এর বদলে প্রাথমিকভাবে কিছু হিসেবনিকেশ করার "স্কোরিং" পদ্ধতি আছে, তবে "স্লিপ স্টাডি"-ই কাজের। বিদেশে বাড়িতে করে নেবার বন্দোবস্ত থাকলেও আমাদের দেশে বিশেষ বাণিজ্যিক পরীক্ষাগারে গিয়ে "স্লিপ স্টাডি" করে নেওয়াই দস্তুর।

'স্লিপ স্টাডিতে কী রোগ ধরা পড়বে?'—সুতনু প্রশ্নের শেষ রাখতে চান না। ডাক্তার বলে চলেন, কেবল রোগ ধরাটাই স্লিপ স্টাডির উদ্দেশ্য নয়। রোগের মাত্রা নির্ণয় আর চিকিৎসার নির্দেশিকা হিসাবে স্লিপ স্টাডি একমাত্র অবলম্বন ডাক্তারদের। রাতের স্বাভাবিক ঘুমের সময় প্রতি ঘণ্টায় গড়পড়তা কতবার শ্বাসরোধের ঘটনা হচ্ছে সেটাকে পরিভাষায় "অ্যাপনিয়া-হাইপোঅ্যাপনিয়া ইনডেক্স" বলে। এই সংখ্যাটা পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে থাকলে মৃদু মাত্রার অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগের অস্তিত্ব আছে বলা যাবে; এমন ক্ষেত্রে এই রোগের লক্ষণগুলি সাধারণত প্রচ্ছন্ন থাকে, কেবল নিকট আত্মীয় বা কর্মক্ষেত্রের পরিচিতরা দিনের বেলা অনুপযুক্ত স্থানে ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনা দেখে কোনো একটা আস্বাভাবিক অবস্থা আছে এটা অনুমান করতে পারেন। মাঝারি মাত্রার সমস্যায়, যখন অ্যাপনিয়া-হাইপোঅ্যাপনিয়া ইনডেক্স পনেরো থেকে ত্রিশের মধ্যে হয়, রোগী নিজে দিনের বেলায় বেঠিক স্থানে ঘুমিয়ে পড়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। এই পর্যায়ের রোগের মাত্রায় গাড়ি চালানোর সময় অ্যাক্সিডেন্ট হবার ভয় থাকে বলে অনেকে অবচেতনভাবেই গাড়ি চালানোর আগে একটু ঘুমিয়ে নেন ও গাড়ি চালানোর ফাঁকে মাঝেমধ্যে চা বা কফি পান করে নেন। তীব্র মাত্রার রোগে অ্যাপনিয়া-হাইপারঅ্যাপনিয়া ইনডেক্স ত্রিশের বেশি হয়। ঘুমের মধ্যে রক্তে অক্সিজেনের সম্পৃক্ততা ৯০ শতাংশের নীচে নেমে যায়, যেটা ১০০ শতাংশ থাকলে সুস্থ বলা হয়। এই মাত্রায় ভোগা ব্যক্তিদের দিনের কাজকর্ম এমনভাবে ব্যাহত হয় যেটা চারপাশের মানুষের নজরে পড়তে বাধ্য। এদের কাজ করার সময় চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় অথবা চলন্ত বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাতে দেখা যায়। বেজায়গায় ঘুমিয়ে পড়ার জন্য বহু ক্ষেত্রে পেশি শিথিল হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে এদের আঘাতজনিত ক্ষতি হতে পারে। উচ্চরক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, হার্টের ছন্দপতনের রোগে হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনা এই তীব্র মাত্রায় ভোগা ব্যক্তিদের বেশি দেখা যায়।

সুতনু ব্যাজার মুখে বাক-হারা হয়ে মেঝের মোজাইকের প্যাটার্ন দেখছিল আর ওর স্ত্রীর চোখের পাতা হল ভারী। ডাক্তার বললেন, এই অবধি শোনার জন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিন সুতনুবাবু। আপনি আমার কথা পুরোটা না শুনেই আমাকে পারিশ্রমিক দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। এবারে শেষটুকু শুনলে শরীরের সঙ্গে মনও ভালো হয়ে যেতে পারে। চিকিৎসাটার বিষয়টা শুনে যান। আসলে আপনার কাছে মাত্র দুটো পন্থা খোলা আছে। যেকোনো উপায়ে শরীরের ওজন কমান, হয়তো এটাই আপনার জীবনের শেষ সুযোগ। নতুবা দ্বিতীয় চিকিৎসার জন্য আগে যে পাম্পের কথা বললাম, সেই পাম্প কিনে ফেলুন। বিদ্যুতে চলে সেই পাম্পের নাম "কন্ট্যুনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার", সংক্ষেপে "সিপ্যাপ", বা সিপিএপি। প্রতিরাতে পাম্প মেশিনের মুখোশ লাগিয়ে ঘুমাতে যেতে হবে। এটা করে যেতে হবে জীবনভোর। তীব্র মাত্রার অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগে, অর্থাৎ যাঁদের প্রতি ঘণ্টায় অ্যাপনিয়া-হাইপোঅ্যাপনিয়া ইনডেক্স ত্রিশের বেশি হয় তাঁদের প্রাণনাশের ঝুঁকি স্বাভাবিক ব্যক্তিদের চেয়ে দ্বিগুণ থেকে তিন গুণ হয়ে থাকে। কন্ট্যুনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশারের চিকিৎসার উদ্দেশ্য সেটা প্রতিরোধ করা।

সুতনুর শেষ প্রশ্ন, কেবল আমার রাতের ঘুমের ইতিবৃত্ত শুনে, আপনি কতটা নিশ্চিত যে আমার অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়েছে? এই ঘটনাটা আবার আমি পুরোটা নিজেই জানি না। আমার শয্যাসঙ্গীর কাছ থেকে আপনি যেমন শুনলেন, আশ্চর্যের কথা একই সঙ্গে আমিও আসলে প্রথমবার বিস্তারিত শুনলাম। এমনটা কি আর কোনো কারণে হতে পারে না? ডাক্তার বলতে লাগলেন, অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার মতো প্রায় একই ধরনের আর একটা রোগ আছে যার নাম "সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া" (Central sleep apnea , CSA, Cheyne-Stokes breathing)। এটা অপেক্ষাকৃত বিরল আর প্রাথমিকভাবে মস্তিষ্কের ও হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ। সেই রোগেও ঘুমের মধ্যে এমন করে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মতো ঘটনা ঘটে, তবে সেটায় বিশেষ রকমের ফারাক আছে। এমন ক্ষেত্রে শ্বাসরোধের মুহূর্তগুলিতে শ্বাস নেবার প্রক্রিয়াটা স্তিমিত

হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস নেবার চেষ্টাটাও যেন ঘুমিয়ে পড়ে। আপনার ক্ষেত্র ওই সময় ঘড় ঘড় শব্দে খাবি খাওয়ার মতো করে জোরে জোরে শ্বাস নেবার চেষ্টা সক্রিয় হয়ে যায়, পাশে শুয়ে থাকা মানুষটির ঘুমের বারোটা বেজে যায়। ঘুমের মধ্যে সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়ার রুগীদের রক্তে নিঃশব্দে কার্বনডাইঅক্সাইড জমতে থাকে আর অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। তবে এই রোগলক্ষণ সাধারণত অন্য কোন বড়ো ধরনের রোগের অনুষঙ্গ হিসাবে প্রকাশ পায়। তার মধ্যে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কমে যাওয়ার রোগ বা "হার্ট ফেলিয়োর" ও মস্তিষ্কের স্ট্রোক (cerebral stroke) উল্লেখযোগ্য।

সুতনু ও তার স্ত্রী ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে ডাক্তার বললেন, আপনাকে আজ কোনো ওষুধ-বিষুধ দিতে পারলাম না। কারণ এই রোগের রোগমুক্তি আপনার নিজের হাতে। আমার এই কথাগুলো আপনার মনে থাকলে কাজে আসবে। মনে রাখায় সাহায্য করার জন্য আমি একটা সারাংশ লিখে দিচ্ছি। কাজে লাগবে।

অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার সাতকাহন

১. অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় রাতের ঘুমের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারা রাত ধরে পর্যায়ক্রমে শ্বাসরোধ বা অ্যাপনিয়ার পর্যায় আর পরক্ষণেই তার সংশোধনী প্রক্রিয়া হিসাবে ঘন ঘন ও জোরে জোরে, শ্বাস নেবার বা পর্যায় চলতে থাকে সংকুচিত শ্বাসনালীর উপরের অংশের (গলনালী, ওরোফ্যারিংস) মধ্য দিয়ে। রাতের ঘুম দিনের ক্লান্তি দূর করতে পারে না। অতৃপ্ত ঘুম দিনের বেলায় বেসময়ে বেজায়গায় চেতনাকে অধিকার করে বসে। কাজে মন বসে না, মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হয়। ধীরে ধীরে রোগ তার আধিপত্য বিস্তার করে বলে প্রথমের দিকে দিনের বেলায় সঙ্গীসাথীদের নজরে না পড়লেও, রাতে যে বা যাঁরা ওই ঘরে বা তাঁর পাশে শুয়ে থাকেন তাঁর আতঙ্কের নাকের আওয়াজ পাশে শুয়ে থাকা মানুষটিকে জাগিয়ে দেবেই।

২. এটা যে একটা রোগ, তার চিকিৎসা দরকার এটা বুঝে উঠতেই বেশ দেরি হয়ে যায়। অন্য কারণে ডাক্তারের কাছে গেলে আর রোগীর শয্যাসঙ্গী বা সঙ্গিনী রোগীর সঙ্গে থাকলে অনেক সময়ে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোনোর সময়ে অকিঞ্চিৎকর, এমনকী হাস্যকর এক সমস্যা হিসেবে তিনি এই ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারেন। ডাক্তার সময়ের চাপে না থাকলে আর আগ বাড়িয়ে মূল সমস্যার (যেমন ব্লাড প্রেশারের রোগ বা সাধারণ সর্দিকাশির রোগ) বাইরে নাক ডাকিয়ে ঘুমানোর তদন্ত করার মেজাজে থাকলে তবেই ডাক্তার এই অল্প পরিচিত অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারেন। এমন ধারা অনেক বিরল ঘটনার সমাবেশ হলেই অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগের অস্তিত্বের অনুমান সম্ভব।

৩. অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগ থাকতে পারে এটা অনুমান করার পরে প্রয়োজন এই রোগের উপস্থিতি নিশ্চিত বা নির্মূল করা। "পলিসোম্নোগ্রাফি", বা "স্লিপ স্টাডি" এই রোগের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার একমাত্র কাজের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার দ্বারা রোগের মাত্রা ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।

৪. "স্লিপ স্টাডি" পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে এক রাত ঘুমাতে হয়। রাতের স্বাভাবিক ঘুমের সময় প্রতি ঘণ্টায় গড়পড়তা কতবার শ্বাসরোধের ঘটনা হচ্ছে সেটাকে পরিভাষায় "অ্যাপনিয়া-হাইপোঅ্যাপনিয়া ইনডেক্স" বলে, যেটার মাত্রা নির্ণয় করা "স্লিপ স্টাডি" পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। অ্যাপনিয়া-হাইপোঅ্যাপনিয়া ইনডেক্স পাঁচের বেশি হলে অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা যাবে। অ্যাপনিয়া-হাইপোঅ্যাপনিয়া ইনডেক্সের মাত্রা চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৫. অল্প মাত্রার অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগে স্থূল ব্যক্তিদের শরীরের ওজন কমানো একমাত্র চিকিৎসা। এটা সম্ভবত রোগীর কাছে রোগ নিরাময়ের শেষ সুযোগ। রোগা হওয়ার এমন অসহায় প্রয়োজন বোধহয় আর কোনো রোগে দেখা যায় না। অন্য রোগে মোটা রুগীদের বাঁচিয়ে রাখার ও কষ্ট কমানোর বিকল্প বহু উপায় আছে। এই রোগে একমাত্র চিকিৎসাটি ঠেকা দেওয়ার চিকিৎসা। সেটা "সিপ্যাপ" নামের একটি মেশিনের সাহায্যে ঘুমানোর চিকিৎসা।

৬. শরীরের অতিরিক্ত মেদের বোঝা না ঝরাতে পারলে এই রোগের চিকিৎসার দ্বিতীয় ও শেষ অবলম্বন "সিপ্যাপ (CPAP)" বা "কন্ট্যুনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার" নামে একটা পাম্প। বিদ্যুতে চলে সেই পাম্প। প্রতিরাতে পাম্প মেশিনের মুখোশ লাগিয়ে ঘুমাতে যেতে হবে আর এটা করে যেতে হবে জীবনভোর।

৭. প্রতি রাতে "কন্ট্যুনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার" ব্যবহার করলে রাতের ঘুম তৃপ্তিদায়ক হবে, নাকের ডাকের শব্দ থেকে পাশের মানুষটিও রেহাই পাবেন। দিনের কাজে মন বসাতে পারবেন। আগের মতো কাজে দক্ষতা ফিরে পাবার পরে হয়তো ভুক্তভোগী মানুষটি পার্থক্যটা ধরতে পারবেন, উপলব্ধি করতে পারবেন তিনি আসলে ততোটা বুড়ো হয়ে যাননি। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপের রোগ, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিসের মতো রোগসম্ভাবনা বা রোগের তীব্রতা কমবে। মারণাত্মক হৃদ্‌পিণ্ডের ছন্দপতনের রোগ হিসাবে ভেন্ট্রিক্যুলার টাকিকার্ডিয়া ও ফিব্রিলেশন থেকে মিলবে সুরক্ষা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, কার্ডিয়োলজিস্ট; প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

আর্টিকেরিয়া বা আমবাত

আর্টিকেরিয়া, বাংলায় বলে আমবাত। হলে ভয় পাবার কিছু নেই, সাধারণত নিজে থেকেই সেরে যায়। সামান্য কিছু ওষুধ অনেক সময় নিজেই ব্যবহার করা যায়। বেশি হলে বা বেশিদিন থাকলে চিকিৎসকের কাছে যান। চিকিৎসায় একগাদা পরীক্ষানিরীক্ষার দরকার খুব কম ক্ষেত্রে হয়, তবে রোগের ইতিহাস ভালোভাবে নেওয়া দরকার—লিখেছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

আর্টিকেরিয়া হল চামড়ায় লাল, উঁচু, দাগ, যা চুলকোয় ও কিছুক্ষণ পরে কমে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একাধিক এরকম লাল দাগ দেখা দেয় ও এক জায়গায় দাগ কমে গেলেও অন্য জায়গায় তখনই বা পরে ঐরকম দাগ বেরোয় ও চুলকায়। কোনো অজানা কারণে এটাকে বাংলায় অনেক সময়ে আমরা 'অ্যালার্জি' নামে ডাকি।

আমাদের কাছে অনেক সময় রোগীরা এসে বলেন, ডাক্তারবাবু, আমার অ্যালার্জি হয়েছে। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা বলতে চান, তাঁদের আর্টিকেরিয়া বা আমবাত হয়েছে। কিন্তু অ্যালার্জি মানে তো কেবল আমবাত নয়। আমবাত ছাড়াও অনেকরকমভাবে চামড়ায় অ্যালার্জি হতে পারে। যেমন স্পর্শজনিত অ্যালার্জিক একজিমা— অনেকের গয়না, সেফটিপিন কিংবা ঘড়ির ধাতু চামড়ার যেখানে লেগে থাকে সেখানে ধাতুতে অ্যালার্জির জন্য একজিমা হয়—সেটাও একটা অ্যালার্জি, অর্থাৎ সব চামড়ার অ্যালার্জি আমবাত নয়। আবার চামড়া ছাড়াও অ্যালার্জি হতে পারে, যেমন বাড়ির ধুলো থেকে অনেকের অ্যালার্জিক হাঁচি হয়। তাই আমবাত বোঝাতে 'আমার অ্যালার্জি হয়েছে' বললে ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমবাত বা আর্টিকেরিয়া সাধারণত খুব চুলকায়। এক-একটা লাল দাগের মাপ আলপিনের মাথার মতো ছোটো সাইজের থেকে এক-দুই বিঘত বড়ো হতে পারে। সাধারণত আর্টিকেরিয়ার লাল দাগগুলো একের পর এক বেরোয়, ও তারপর পাঁচ-সাত দিন পরে কমে যায়। তবে কোনো সময়ে এগুলো অনেকদিন ধরে থাকে, তখন তা কষ্ট ও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার, কখনো চুলকানি এত বেশি হয় যে সহ্য করা যায় না। শিশুদের ক্ষেত্রে কষ্ট বেশি, মা-বাবার ভয়ও বেশি বেশি হয়।

ডাক্তাররা আর্টিকেরিয়াকে দু-রকম ভাগে ভাগ করেন। ছ-সপ্তাহের কম ধরে আর্টিকেরিয়া থাকলে তাকে বলেন অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়া, আর তার চাইতে বেশি হলে বলেন ক্রনিক আর্টিকেরিয়া। আর একটা বিরল ধরনের আর্টিকেরিয়া আছে—আর্টিকেরিয়া ভ্যাস্কুলাইটিস। এতে এক-একটা লাল ফোলা দাগ একদিনেরও বেশি সময় ধরে থাকে, ব্যথা হয় ও সারার পরে কালশিটে দাগ থাকে।

কখন ডাক্তার দেখানো দরকার ?

ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর পরামর্শ, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আর্টিকেরিয়া হওয়া বন্ধ না হলে ডাক্তার দেখানো উচিত। এছাড়াও—

চিত্র ১. ডার্মোগ্রাফিজম—আমবাতের এক বিশেষ ধরন

- খুব বেশি আর্টিকেরিয়া হলে,
- কষ্ট বেশি হলে,
- দৈনন্দিন কাজে বিঘ্ন ঘটলে,
- আর্টিকেরিয়ার সঙ্গে অন্য লক্ষণ থাকলে—

ডাক্তার দেখাতে হবে।

আর্টিকেরিয়া কার হতে পারে?

অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়া, যাকে স্বল্পসময়ের আর্টিকেরিয়াও বলা যায়, খুব সাধারণ ব্যাপার, অনেকেরই হয়ে থাকে। মোটের ওপর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের সারা জীবনে একবার-না-একবার অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়া হয়। বাচ্চাদের আর ৩০ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলাদের অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়া বেশি হয়। যাদের কোনো জিনিসে অ্যালার্জি আছে তাদের অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়া হবার সম্ভাবনাও বেশি—যেমন যাদের বাড়ির ধুলোতে অ্যালার্জি আছে তাদের ধুলো থেকে অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়া (সঙ্গে হয়তো বা হাঁচি) হতে দেখা যায়।

ক্রনিক আর্টিকেরিয়া বা দীর্ঘমেয়াদি আর্টিকেরিয়া তুলনায় অনেক বিরল। ব্রিটেনে ২০০ জনের মধ্যে মাত্র একজনের সারা জীবনে কোনো এক সময়ে এই রোগ হয়। এদেশের এই পরিসংখ্যান জানা নেই।

আর্টিকেরিয়ার কারণ কী?

বিজ্ঞানীরা বলবেন, কোনো কারণে চামড়ায় হিস্টামিন ও সেই জাতীয় পদার্থ বেশি নির্গত হলে আর্টিকেরিয়া হয়।

কিন্তু এভাবে বললে সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝবেন না। সরল ভাষায় বললে, কিছু কিছু রাসায়নিক আমাদের শরীরের মধ্যে থাকে, চামড়ার তলায় যেগুলো বেশি বেরোলে সেখানকার রক্তনালীগুলো চওড়া হয়ে যায়। তারপর সেই রক্তনালী থেকে রক্তরস চামড়ার নীচের দিকে জমা হয়। রক্তনালীগুলো চওড়া হবার ফলে চামড়াটা লালচে দেখায়, আর রক্তরস চামড়ার নীচের দিকে জমা হবার ফলে জায়গাটা ওইরকম ফুলে ওঠে।

কিন্তু হিস্টামিন ইত্যাদি বেশি বেরোয় কেন?

তার অনেক কারণ থাকতে পারে—

- অ্যালার্জি—যেমন অনেকের ডিম, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া এসব খেলে আর্টিকেরিয়া হয়। বোলতা বা মৌমাছির কামড় খেয়ে সারা গায়ে আর্টিকেরিয়া বেরোনো অ্যালার্জির কারণে হয়।
- আবহাওয়া—বেশি ঠান্ডায়।
- সংক্রমণ—যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্য কোনো ভাইরাস সংক্রমণ।
- ওষুধ—যেমন স্টেরয়েড নয় এমন ব্যথা-প্রদাহ কমানোর ওষুধ, যথা অ্যাস্পিরিন, নানা অ্যান্টিবায়োটিক। রক্তচাপ কমানোর এসিই ইনহিবিটর গোত্রের ওষুধ হিস্টামিন বেশি বের করে, কিন্তু তার জন্য আর্টিকেরিয়ার চাইতে অ্যাঞ্জিওইডিমা (পরে দেখুন) বেশি হয়।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আর্টিকেরিয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দীর্ঘমেয়াদি আর্টিকেরিয়া অনেক সময় আমাদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার ভুল কাজের জন্য হতে পারে—সেখানে আমাদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুল করে আমাদেরই দেহের সুস্থ কোষকে আক্রমণ করে। এই শেষ ক্ষেত্রে রোগের কারণ বোঝা মুশকিল, রোগ সারানোও মুশকিল। এর চিকিৎসা কিন্তু মোটামুটি অন্য আর্টিকেরিয়ার মতোই।

আবার কিছু কিছু ব্যাপার আছে যারা আর্টিকেরিয়া সৃষ্টি করে না, কিন্তু আর্টিকেরিয়ার কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। যেমন—মদ খাওয়া, ক্যাফিন (কফিতে থাকে), মানসিক উদ্বেগ, বেশি গরম আবহাওয়া।

চিত্র ২. আমবাত—বড়ো চাকা চাকা লাল দাগ

আর্টিকেরিয়া চিনবেন কীভাবে?

একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান আর্টিকেরিয়া দেখলেই চিনতে পারেন—

চিত্র ৩. অজস্র ছোটো ছোটো আমবাত

লাল রঙ, ফোলা, চুলকানি, আর কিছুক্ষণ পরে সেগুলো মিলিয়ে যাওয়া, এবং অন্য কোথাও ফিরে আসা। তারপর চিকিৎসক হয়তো কিছু প্রশ্ন করে বুঝতে চাইবেন কী কারণে আর্টিকেরিয়া হচ্ছে—কিছু খাওয়ার পরে, জ্বর ইত্যাদি সংক্রমণের পরে, অথবা কোনো ওষুধ খাবার পরে যদি আপনার আর্টিকেরিয়া হয় তাহলে হয়তো কোনো ল্যাবরেটরির পরীক্ষাই করার দরকার হবে না। আপনার আর্টিকেরিয়া যদি ছ-সপ্তাহ সময় জুড়ে অধিকাংশ দিনই দেখা দেয় তবে তা অ্যালার্জির জন্য হবার সম্ভাবনা কম। একটা সামগ্রিক রক্তকণিকা গণনা, ইএসআর ইত্যাদি সাধারণত করা হয়। এ ছাড়া মল পরীক্ষা করে কৃমি আছে কিনা দেখা, থাইরয়েডের পরীক্ষা করা, লিভার ফাংশন টেস্ট—এসবও দরকার হতে পারে। তারপর অ্যালার্জি পরীক্ষা করা হতে পারে। চিকিৎসক রোগের ইতিহাস নিয়ে, আপনাকে পরীক্ষা করে দেখে, সম্ভাব্য কারণের সম্পর্কে ধারণা করে সেইমতো এইসব বা অন্য কিছু পরীক্ষা করাতে পারেন, অথবা নাও পারেন।

আর্টিকেরিয়ার চিকিৎসা

অনেক সময় চিকিৎসা করার দরকার হয় না; আর্টিকেরিয়া দু-চারদিনের মধ্যে একেবারে সেরে যায়। তবে চুলকানি কমানোর জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন বড়ি খেতে পারেন—আর্টিকেরিয়ায় সাধারণত লিভোসেট্রিজিন বা ওইধরনের তৃতীয় জেনারেশনের অ্যান্টিহিস্টামিন দেওয়া হয় যাতে ঘুম কম পায়; কিন্তু তবু একটু ঘুমভাব হতে পারে। তাই এসব ওষুধ খেয়ে গাড়ি চালানো বা ওইজাতীয় কাজ করা উচিত নয়। আর মনে রাখবেন, মদ খেলে অ্যান্টিহিস্টামিন বেশি ঘুমভাব সৃষ্টি করে।

খুব বেশি আর্টিকেরিয়া হলে চিকিৎসক অ্যান্টিহিস্টামিন ইঞ্জেকশন দিতে পারেন, এমনকী স্টেরয়েড দিতে পারেন—কিন্তু এগুলো নিজের সিদ্ধান্তে বা অ-চিকিৎসক কারও পরামর্শে ব্যবহার করবেন না। এছাড়া র্যা নিটিডিন জাতীয় ওষুধ, যা সাধারণত পাকস্থলির অ্যাসিড কমানোর কাজে লাগে, আর্টিকেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ক্যালামিন লোশন ও মেন্থল-জাতীয় ক্রিম স্থানীয় চুলকানি কমায়, কিন্তু আর্টিকেরিয়া হওয়া কমায় না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা দুরারোগ্য বা বাড়াবাড়ি ধরনের আর্টিকেরিয়ায় আরও কিছু ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন, সে নিয়ে এখানে আলোচনা করে লাভ নেই।

চিত্র ৪. আমবাতে চামড়া উঁচু হয়ে ফুলে ওঠা

কিন্তু ওষুধ খাওয়া আর্টিকেরিয়ার একমাত্র চিকিৎসা নয়। খাদ্যে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে যায় এমন জিনিসে (যেমন ঘরের ধুলো) অ্যালার্জি থাকলে সেই খাদ্য/নিঃশ্বাসে যাওয়া জিনিস সারাজীবন এড়িয়ে চলতে হবে, সেটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু খাদ্যে, বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত বা প্যাকেজড খাদ্যে, অনেক রাসায়নিক মেশানো হয়। তার মধ্যে কৃত্রিম রং ও প্রিজারভেটিভ (খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত রাসায়নিক) আর্টিকেরিয়া করবার সম্ভাবনা বেশি। অনেক সময় সেগুলো কয়েক সপ্তাহ বন্ধ রেখে দেখতে হয় তাতে দীর্ঘমেয়াদি আর্টিকেরিয়া কমল কিনা।

এছাড়া মদ, অতিরিক্ত গরম, পরিশ্রম ও মানসিক চাপ—এদের এড়িয়ে চলা আর্টিকেরিয়া কমাতে সাহায্য করতে পারে। সবার ক্ষেত্রে সব পদক্ষেপ কাজে লাগবে, তা কিন্তু নয়।

আর্টিকেরিয়া হলেই ভয় পাবার কিছু নেই। যদি সেটা বেশিদিন থাকে বা বেশি কষ্ট দেয়, চিকিৎসকের কাছে যান। সাধারণত এটা সামান্য কিছু ওষুধেই নিয়ন্ত্রিত হয় ও নিজে থেকেই সেরে যায়।

আর্টিকেরিয়া থেকে জটিলতা

আর্টিকেরিয়ার রোগীদের কারো কারো অ্যাঞ্জিওইডিমা হতে পারে। অ্যাঞ্জিওইডিমা হল চামড়ার নীচে উদ্ভুত ফোলা। অ্যাঞ্জিওইডিমা আকারে বড়ো হয়, লালভাব থাকে না বললেই চলে, চুলকাবেই এমন বলা যায় না ও আর্টিকেরিয়ার সীমারেখা যেমন সুস্পষ্ট অ্যাঞ্জিওইডিমার সীমারেখা তেমন সুস্পষ্ট হয় না। চোখের পাতা, ঠোঁট, জননাঙ্গ, হাত-পায়ের পাতা—এসব জায়গায় অ্যাঞ্জিওইডিমা বেশি হয়। অ্যাঞ্জিওইডিমার চিকিৎসায় অ্যান্টিহিস্টামিন ব্যবহৃত হয়, আর স্টেরয়েড ব্যবহারের সম্ভাবনাও এক্ষেত্রে তুলনায় বেশি। অ্যাঞ্জিওইডিমার ক্ষেত্রে প্রথমেই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। বংশগত অ্যাঞ্জিওইডিমার চিকিৎসা জটিল এবং কেবল বিশেষজ্ঞের এক্তিয়ারে পড়ে; এখানে সে কথায় বিশেষ লাভ নেই।

অ্যানাফাইল্যাক্সিস

অ্যাঞ্জিওইডিমা-র মতোই এই কথাটার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। তবে আর্টিকেরিয়া এবং/অথবা অ্যাঞ্জিওইডিমা—এদুটোর যেকোনোটাই অ্যানাফাইল্যাক্সিসের লক্ষণ হতে পারে। আর্টিকেরিয়া/অ্যাঞ্জিওইডিমা ছাড়া অ্যানাফাইল্যাক্সিসের অন্যান্য উপসর্গ ও লক্ষণগুলো হল—

- মাথা ঝিমঝিম করা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।
- শ্বাসকষ্ট, শ্বাস আটকানোর শব্দ।
- পেটে ব্যথা, গা গোলানো, বমি।
- শরীরের শক্তি হারিয়ে পড়ে যাওয়া।

অ্যানাফাইল্যাক্সিসকে সর্বদা ইমার্জেন্সি বা জরুরি হিসেবে চিকিৎসা করতে হবে, নইলে বিপদ হতে পারে।

সবশেষে

আর্টিকেরিয়া হলেই ভয় পাবার কিছু নেই। যদি সেটা বেশিদিন থাকে বা বেশি কষ্ট দেয়, চিকিৎসকের কাছে যান। সাধারণত এটা সামান্য কিছু ওষুধেই নিয়ন্ত্রিত হয় ও নিজে থেকেই সেরে যায়। যেগুলো সারতে বেশিদিন নেয়, সেগুলোর জন্য চিকিৎসকের উচিত ভালোভাবে রোগের ইতিহাস নেওয়া ও দরকারমতো পরীক্ষা করানো। খুব কম ক্ষেত্রেই একগাদা পরীক্ষার দরকার হয়। আপনার চিকিৎসক যদি ভালোভাবে ইতিহাস নেওয়া অবহেলা করে তড়িঘড়ি গুচ্ছের পরীক্ষা করতে দেন, বুঝবেন তিনি ঠিকভাবে চিকিৎসা করছেন না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর রোগীদের জন্য তথ্যভাণ্ডার, ইন্টারনেটে http://www.nhs.uk/conditions/Nettle-rash/Pages/Introduction.aspx -তে লভ্য।

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

সীমান্ত জীবন

পর্ব ৩

ডা. মৃন্ময়

বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিরুদ্ধ মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে। পাড়ার চায়ের দোকান হোক বা ফেসবুক বা কলেজ ক্যাম্পাস, সব জায়গায় এর রেশ স্পষ্ট। কেউ কার্টুন এঁকে জেলে যাচ্ছেন তো কাউকে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে হাপিশ করে সোজা পুলিশ হেফাজতে। এমত অবস্থায় বিরুদ্ধ মত বা প্রতিবাদ তো দূরের কথা, অন্যের কাছে নিজের রোজকার অসুবিধে প্রকাশ করার পরিসর সীমান্ত জীবনে কতটুকু?

বেশ কিছুদিন আগে স্বরূপনগরে সীমান্ত-রক্ষীদের নির্যাতন এর শিকার ও তাদের পরিবার-এর জন্যে একটি মেডিক্যাল ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। সেখানে মলয়বাবুর সাথে আলাপ। মলয়কান্তি বিশ্বাস (নাম পরিবর্তিত)। মলয়বাবুর সাথে কথোপকথনের অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই।

মলয় বাবু আপনি কী কাজ করেন?

- আমি ফারাক্কা তে ১০০ দিনের কাজের সুপারভাইজার।

ফারাক্কা থেকে এই স্বরূপনগর এত দূরে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন?

- না না . . .। আসলে আমার বাড়ি গড়জ্বালা। বর্ডার থেকে এক কিমি আগে। আগে নৈহাটি জুট মিলের শ্রমিক ছিলাম। ঝামেলার পর ফারাক্কা চলে যাই। ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছি ডাক্তার দেখাতে।

কী ঝামেলা হয়েছিল? মানে . . . যদি আপনার অসুবিধে না থাকে তাহলে বলতে পারেন।

- (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর, দীর্ঘশ্বাস ফেলে) . . .। পনেরো সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ের কথা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কারেন্ট ছিল না তাই ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। কিছুটা ঘুরে এসে বাজারে মেজোভাই-এর দোকানের বারান্দায় বসে ভাইপোর সাথে গল্প করছিলাম। এমন সময় দুজন BSF জওয়ান টহলদারি করতে করতে ও পুব দিক থেকে এসে কিছুটা দূর থেকে মুখে টর্চের আলো ফেলে। আমি চোখের ওপর হাত দি আলো আটকানোর জন্যে। তারপর জওয়ানরা দুজন মিলে আমার মুখের ওপর টর্চ এর আলো টানা ফেলতে থাকে আর হাসাহাসি করতে থাকে। ভাইপোকে বলি—দেখ কী বাজেভাবে টর্চের আলো ফেলছে মুখে।

তখন একজন জওয়ান এগিয়ে এসে বলে, "কী বললি শুয়োরের বাচ্চা?"

আমি উত্তর দি, "আপনাকে কিছু বলিনি। ভাইপোকে বলছিলাম।"

তারপর দুজন মিলে আমাকে আর ভাইপোকে খারাপ খারাপ গালাগাল দিতে থাকে। তখন আমি বলি, " শুধু শুধু গালাগাল দিচ্ছেন কেন? আমি আপনাদের কিছু বলিনি তো।"

জওয়ান গালি দিতে-দিতে বলে, "মুখের ওপর কথা! এত বড়ো সাহস! . . . দেখাচ্ছি . . ."। তারপর নাকে টর্চ দিয়ে মারে। নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল তাই হাত দিয়ে নাক-মুখ চাপা দি। তখন টর্চ দিয়ে কপালে মারে। আমি পড়ে যাই। ভাইপো ভয়ে পালিয়ে যায়। তারপরেও জওয়ানরা বন্দুকের বাট দিয়ে মাথায় ঘাড়ে পিঠে মারে। আমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। পরে বাড়ির লোক হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এত কিছু হল বাজারে কেউ কিছু বলল না?

- ওইদিন তো শুক্রবার ছিল। আমাদের বাড়ির দিকে শুক্রবার বাজার বন্ধ থাকে।

ও . . .। তারপর কী হল?

- বাড়ির লোকজন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় অন্য তিনজন জওয়ান আসে গাড়ি করে। এসে বলে—দুই লক্ষ টাকা ও চিকিৎসার খরচ দেবে। কিন্তু কোনো পুলিশি অভিযোগ করা যাবে না আর কাউকে জানানো যাবে না। আর ওদের গাড়ি করে ওদের ক্যাম্পে যেতে হবে।

বাড়ির লোকজন রাজি হয়নি। আগে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কপালে আর মাথায় ১৬ খানা সেলাই দিতে হয়। ওখান থেকে বনগাঁ হাসপাতালে রেফার করে দেয়। মাঝে বাড়ির লোকজন থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে প্রথমে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। বলে জওয়ানদের সাথে মিটিয়ে নিতে। পরে ঝামেলা করতে অভিযোগ নেয়। কিন্তু FIR দায়ের না করে শুধু জেনারেল ডায়েরি করে।

এদিকে বনগাঁ হাসপাতালে গেলে জানায়, আগে পুলিশ অভিযোগ না দিলে ভর্তি করা যাবে না। প্রায় তিন ঘণ্টা

অপেক্ষা করানো হয়। তারপর GD-এর কাগজপত্র বাড়ির লোক থানা থেকে আনার পর ভর্তি নেওয়া হয়।

ভর্তির সময় হাসপাতালে থাকা পুলিশ জানায় যে GD-এর জেরক্স কপি দিলে ভর্তি করা যাবে না আসল কপি দিতে হবে। পুলিশ GD-এর আসল কপি নিয়ে নেয় ও পরে অস্বীকার করে। হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় মাঝে মাঝে পুলিশ চাপ দিতে থাকে কেস তুলে নেওয়ার জন্যে। বাড়ির লোককে ভয় দেখায় যে কেস না তুললে পালটা গাঁজা ও হেরোয়িন পাচারের কেস দেবে।

কত দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন?

- মাথার ভেতর রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল আর নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। তিন সপ্তাহ ভর্তি থাকতে হয়েছিল।

এখনও কেস চলছে?

- হ্যাঁ . . .। কিছুই হয় না। ডেটের পর ডেট দেয় আর মাঝে মাঝে BSF বাড়িতে এসে শাসিয়ে যায় কেস তোলার জন্যে। এভাবেই চলছে দেড় বছর ধরে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসার জন্য গড়ে ওঠা হাওড়ার একটি ক্লিনিকের চিকিৎসক।

হরেকরকম

ডেন্টাল ফিলিং দিয়ে দন্তক্ষয় আটকায়? পুরোনো ডেন্টাল ফিলিং-এ ক্ষতি কতটা?

লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে গবেষকরা নতুন ধরনের জিনিস দিয়ে দাঁতের কেরিস বা দন্তক্ষয়-এর চিকিৎসা করবার চেষ্টা করছেন। অ্যামালগাম (পারদ, টিন, রুপো ও অন্য ধাতুর মিশেল) দিয়ে তৈরি ডেন্টাল ফিলিং সাধারণত দন্তক্ষয়-জনিত গর্ত ভর্তি করতে ব্যবহার হয়। এই গবেষকরা বায়োঅ্যাক্টিভ গ্লাস কম্পোসিট ব্যবহার করে দেখাচ্ছেন, এই বস্তুটি থেকে ফ্লুরাইড, ক্যালশিয়াম ও ফসফেট নির্গত হয়, আর এই জিনিসগুলো দাঁতের মিনেরাল অংশ তৈরিতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয়-এর কারণ হল দাঁত থেকে এসব মিনেরাল কমে যাওয়া, তাই আশা করা যায় এই বিশেষ দ্রব্য দিয়ে দন্তক্ষয়-জনিত গর্ত ভর্তি করলে পুনরায় দন্তক্ষয় আটকে যাবে।

তাঁরা কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এই বস্তুটি প্রয়োগ করে দেখেছেন দন্তক্ষয় আটকাচ্ছে, আর খানিকটা ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁত ভরাট হচ্ছে। আবার এই বস্তুটি ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে—ফলে জীবাণুর বৃদ্ধি আটকায় ও দন্তক্ষয় কমে। বিশেষ করে আমেরিকায় করা গবেষণা বলছে, জীবাণুর বৃদ্ধি আটকানোর ফলে দাঁতের ফিলিং বেশিদিন টিকছে।

গবেষকরা বলছেন, অ্যামালগামে পারদ থাকে, আর ২০২০-র মধ্যে পারদ-ঘটিত দাঁতের ফিলিং তুলে দেবার চেষ্টা চলছে। এই নতুন ফিলিংটি শুধু আগের ফিলিং-এর কাজ করে তাই নয়, এটা দাঁতকে সারিয়েও তোলে।

অন্যদিকে, বর্তমানে চালু দাঁতের গর্ত বোজানোর ফিলিংগুলো কতটা নিরাপদ, সে প্রশ্নও উঠেছে। একটি সমীক্ষা দেখাচ্ছে, যাদের আট বা তার বেশি ফিলিং আছে তাদের মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র ও বৃক্ক (কিডনি) ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা শতকরা ১৫ ভাগ বাড়ে। ডেন্টাল সারফেস রেস্টোরেশন, বা চালু ভাষায় ডেন্টাল ফিলিং, সাধারণত অ্যামালগাম (পারদ, টিন, রুপো ও অন্য ধাতুর মিশেল) দিয়ে তৈরি। তা থেকে পারদ নির্গত হতে থাকে, আর যাদের আট বা তার বেশি ফিলিং আছে তাদের রক্তে পারদের ভাগ স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা ১৫০ ভাগ বেশি হয়ে যায়।

অ্যামালগাম দিয়ে ডেন্টাল ফিলিং করার ব্যাপারটি ১৫০ বছর ধরে চালু, কেননা এটা দামে কম, আর জানা অন্য নানা দ্রব্যের চাইতে ভালো কাজ করে। শরীরে পারদ ঢোকা নিয়ে ডাক্তারদের দুশ্চিন্তা নতুন নয়। কিন্তু ঠিক কতটা পারদ শরীরে যাচ্ছে আর তার ফলে কতটা ক্ষতি হচ্ছে সেটা সম্প্রতি জর্জিয়া ইউনিভার্সিটির এক গবেষক দল ১৫০০০ মানুষের ওপর সমীক্ষা করে জেনেছেন। এখন মনে হচ্ছে এটা বলাই যায় যে একটা দাঁতে অ্যামালগাম দিয়ে ডেন্টাল ফিলিং তেমন ঝুঁকির ব্যাপার নয়, কিন্তু আটটা দাঁতে তা বেশ ঝুঁকির জিনিস। বিশেষ করে যদি কেউ পেশাগত কারণে পারদের সংস্পর্শে আসে তার বেশি ডেন্টাল ফিলিং না করাই ভালো।

পারদ ক্ষতিকর এটা আমরা সকলেই জানি। তবে যেকোনো নতুন ওষুধ নিয়ে প্রাথমিক যে উৎসাহ থাকে সেটা সবসময় পরে টেকে না। তাই বায়োঅ্যাক্টিভ গ্লাস কম্পোসিট ডেন্টাল ফিলিং সত্যিই কেমন, সেটা নিশ্চিত করে বলতে গেলে অনেকদিন ব্যবহারের পরেই তা বলা সম্ভব।

তথ্যসূত্র: New Dental Fillings May Repair Tooth Decay. Press Trust of India | Updated: October 02, 2016, ইন্টারনেটে http://www.ndtv.com/health/new-dental-fillings-may-repair-tooth-decay-1469129 তে লভ্য; ও Dental fillings can damage your heart, brain and kidneys. *The Times of India* (Delhi). Sep 29 2016 .ইন্টারনেটে http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31808&articlexml=Dental-fillings-can-damage-your-heart-brain-and-29092016023024-তে লভ্য। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

বস্তি জীবনে জনস্বাস্থ্য সমস্যা

ধ্রুবজ্যোতি দে

।। ১।।

রাস্তাটার নাম নয়া সড়ক . . . রাবিশ ফেলে চওড়া করা হচ্ছে রাস্তাটাকে। . . . এক ধারে এক লম্বা বস্তি। . . . বস্তিটার ধার ঘেঁসেই . . . একটা হাল আমলের দোতলা বাড়ি। . . . বস্তি বাড়িটা মান্ধাতা আমলের পড়ে আছে। খোলা ছাওয়া চালা প্রায় মাটি স্পর্শ করেছে। মাথা হাঁটুতে ঠেকিয়ে বেরোতে হয় এখান থেকে। যেন উপর থেকে সমস্ত বস্তিটা ঝপ করে মাটিতে প্রায় গেড়ে বসেছে। অন্ধকারে মনে হয় কালো এবং শেওলা ধরা খোলা সাজানো একটা স্তূপবিশেষ। . . .

. . . সারা দুপুরটা যেন বস্তিটা ঝিম মেরে পড়ে থাকে। বেকার মেয়েরা ও ছোটো বাচ্চারা থাকে ঘাটে মাঠে রেললাইনে গোবর, পোড়া কয়লা কাঠের সন্ধানে। সমস্ত বস্তিটা থেকে যেন ভাপ উঠতে থাকে, ভ্যাপসা দুর্গন্ধ একটা এ সময়েই যেন ফাঁক পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পাশের সুদৃশ্য বাড়িটার . . . দোতলা জানলা থেকে সব সময়েই কিছু না কিছু খোলার চালটায় পড়ছে। থুতু, মেয়েদের আঁচড়ানো চুলের ঝরা গুচ্ছ, কাগজের টুকরো, পরিত্যক্ত নেকড়ার ফালি, এক ঝলক জল। যেন খোলার চালাটা একটা আস্তাকুঁড়।

(উপন্যাসের অংশবিশেষ, *বি টি রোডের ধারে*, সমরেশ বসু)

উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। দারিদ্র্যজর্জর বিবর্ণ ক্লেদাক্ত পরিবেশে যৌথ জীবনযাপনের মধ্যে মানবতার আলোক সন্ধান করেছিলেন লেখক। কিন্তু প্রশ্ন জাগে আজ অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় পরে ওই পরিবেশ কতটা পালটেছে, সারা বিশ্বে, এদেশে এবং এই রাজ্যে। কতটা মুক্তি পেয়েছে মানুষ বস্তিবাসের বাধ্যতা ঠেকে, বস্তির অস্বাস্থ্যকর জীবন থেকে। আজও বস্তি চিহ্নিত হয়ে থাকে ঘিঞ্জি ক্লিন্ন পরিবেশের উপস্থিতি দিয়েই। নগর জীবনের সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিপ্রতীপ অবস্থান নিয়ে বস্তি যেন অনিবার্য হয়েই থাকে শহর নগরের বুকে।

বাসস্থানের পরিবেশ ও পরিকাঠামো: জনস্বাস্থ্যে ঝুঁকি

মানুষ কোথায় কেমনভাবে বসবাস করে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে জীবন তথা স্বাস্থ্যের ওপর। অনুপযুক্ত বাসস্থান বাসিন্দাদের জীবনে নানারকম সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধির সম্ভাবনা তৈরি করে। এভাবে জনস্বাস্থ্যে যে ঝুঁকি আসে তা ১৯৯৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা 'হু') তালিকাবদ্ধ করে এবং ২০০৮-এ পুনঃপ্রকাশ করে। যথা—

ঝুঁকির উৎস: ১. খারাপ জায়গায় বসবাস (যেমন গাড়ি চলা রাস্তার ধার, জঞ্জাল ফেলার মাঠ, ভাগাড় বা দূষণকারী কারখানার পাশে)।

সংক্রামক ব্যাধি: বায়ুবাহিত সংক্রমণ, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রামক অসুস্থতা।

অসংক্রামক ব্যাধি ও মানসিক অসুস্থতা: ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের স্থায়ী বা ক্রনিক অসুখ। ক্যান্সার। দুর্ঘটনা ও আঘাতজনিত অসুস্থতা। স্নায়ু ও জননতন্ত্রের সমস্যা। শিল্পজাত দূষণের ফলে জৈব-মনস্তাত্ত্বিক গোলোযোগ।

ঝুঁকির উৎস: ২. নিকৃষ্ট মানের, ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বাসা।

সংক্রামক ব্যাধি: মশা, মাছি, পোকা-মাকড়, ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি বাহিত সংক্রমণ। পশু প্রাণূর কামড়, মল থেকে সংক্রমণ। এক ঘরে অনেকে বসবাস করায় সংক্রমণের বিস্তার।

অসংক্রামক ব্যাধি ও মানসিক অসুস্থতা: ধুলো, আর্দ্রতা, ছত্রাকজাত অসুখ। আঘাত ও দহনজনিত ক্ষত। স্নায়বিক পীড়া। মদ ও মাদকে আসক্তি। অপরাধমূলক/হিংসাত্মক আচরণ।

ঝুঁকির উৎস: ৩. জল সরবরাহে ও শৌচালয়ের অব্যবস্থা।

সংক্রামক ব্যাধি: মলমূত্রজাত বা কীটজাত জলবাহিত সংক্রমণ। কৃমির প্রাদুর্ভাব। ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি বাহিত সংক্রমণ।

অসংক্রামক ব্যাধি: পাকস্থলি ও অন্ত্রের অসুখ। ক্যান্সার।

ঝুঁকির উৎস: ৪. আবর্জনা রাখা ও ফেলার নিকৃষ্ট ব্যবস্থা।

সংক্রামক ব্যাধি: কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি বাহিত সংক্রমণ।

অসংক্রামক ব্যাধি: পোড়া বা আঘাতজনিত ব্যাধি।

ঝুঁকির উৎস: ৫. ঘরে অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ও খারাপ জ্বালানি।

সংক্রামক ব্যাধি: শ্বাসযন্ত্রে তীব্র সংক্রমণ।

অসংক্রামক ব্যাধি: ফুসফুসে স্থায়ী অসুখ ও ক্যান্সার। হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ। নবজাতকের জন্মগত ত্রুটি। আগুনে পোড়া।

ঝুঁকির উৎস: ৬. ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণ।

সংক্রামক ব্যাধি: মলমূত্রজাত বা কীটজাত জলবাহিত সংক্রমণ। খাদ্যের পচন ও জীবাণুজনিত বিষক্রিয়া।

অসংক্রামক ব্যাধি: ক্যান্সার।

জনস্বাস্থ্যের এইসব ঝুঁকি নিয়েই সারা পৃথিবীতে বসবাস করেন শহরবাসীদের বেশ বড়ো অংশের মানুষ, যাঁদের মধ্যে অনেকেই বস্তিবাসী। যেমন—

বিপজ্জনক খারাপ জায়গায় বসবাস: পৃথিবীতে প্রতি ১০টি অস্থায়ী বাসার ৩-৪টি রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ধস, ভূমিকম্প প্রবণ বিপজ্জনক এলাকায়। প্রায় ৯৮% নিম্ন আয়ের শহরবাসীরা বায়ুদূষণের শিকার।

অস্থায়ী ঘিঞ্জি বাসা: পৃথিবীতে মাত্র ২৮% বস্তিবাসী স্থায়ী। কলকাতায় এমন বস্তি রয়েছে যেখানে ৪৫ বর্গ মিটার বাসায় গড়ে ১৩/১৪ জন থাকেন। ঢাকার কামরাঙির চরে ৩০০ বর্গ কিলোমিটার বস্তিতে ৪ লক্ষ মানুষ বাস করেন।

স্বত্বহীন বাসা: ২০০৩ সালে ৯২.৪ কোটি শহরবাসীর বাসার কোনো স্বত্ব নেই। জমি ক্রমশ দামি হওয়ায় এই সংখ্যা আজ আরও বেশি। উন্নয়নশীল বিশ্বের শহরগুলিতে প্রায় ৮৫% বাসা অবৈধ দখলি জমিতে রয়েছে।

পানীয় জল: বর্তমান বিশ্বে শহরবাসীদের প্রায় ৮০% বাসস্থানে পাইপের জল সরবরাহ পান এবং ৯৬% শহরবাসী অন্যান্য উৎস থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করেন। ২০১১-র সেনসাস তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে শহরবাসীদের ৭০% পাইপের কল থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করেন। তবে তার মান ও পরিমাণ সবসময় উপযুক্ত থাকে না।

শৌচালয়, নর্দমা ও জঞ্জাল অপসারণ: ২০১২-তে বিশ্বে ২০% শহরবাসীর উপযুক্ত মানের শৌচালয় নেই এবং অন্তত ১০ কোটি শহরবাসী উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করেন। ভারতবর্ষের শহরের ১৮.৬% গৃহের অভ্যন্তরে শৌচালয় নেই, বস্তির ক্ষেত্রে এই হার ৩৪%। ভারতের ৩১% বস্তিতে কোনো নর্দমা নেই, ফলে বর্ষায় জল জমা এক নিত্য ব্যাপার। নর্দমা থাকলেও ১৯% বস্তিবাসাতে নর্দমার সংযোগ নেই। এছাড়া ২৭% বস্তিতে জঞ্জাল অপসারণেরও ব্যবস্থা নেই।

বস্তি বলব কাকে?

ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাভাবনায় বস্তি বলতে কেবল রোগব্যাধি ও অপরাধপ্রবণতার আঁতুড়ঘর মনে করা হত। আভিধানিকভাবে মেরিয়াম-ওয়েবস্টার অনুযায়ী 'স্লাম' বা বস্তি হল শহরের এমন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা যেখানকার বাসাগুলি গঠন, ব্যবস্থা ও পরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের ও নোংরা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ব্যাখ্যায় বস্তি হল এমনই নিকৃষ্ট বাসস্থান যেখানে সন্তোষজনকভাবে পারিবারিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। নিকৃষ্ট বাসস্থান বলতে ঘিঞ্জি, ভাঙাচোরা, স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপসা, আলো, বাতাস, শৌচালয়, স্নানঘর সবই অপ্রতুল এবং পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা ও বিনোদনের সুযোগই নেই। বর্তমানে ইউনাইটেড নেশন্‌স (ইউ.এন) বস্তি এলাকার যে সাধারণ সংজ্ঞা স্থির করেছে তাতে বলা হয়েছে বস্তি হল শহরাঞ্চলের এমন এলাকা যেখানে পরস্পর সন্নিহিত বাসাগুলির বাসিন্দারা মৌলিক পরিষেবার অভাব আর অল্প ঠাঁই নিয়ে বসবাস করেন এবং প্রায়শই শহর কর্তৃপক্ষ এই বসতগুলিকে শহরের অংশরূপে কোনোরকম স্বীকৃতি দেন না। আর ইউ.এন.এ-এর কার্যকরী (অপারেশনাল) সংজ্ঞা (২০০২) অনুযায়ী কোনো বাসায় যদি নীচের পাঁচটি নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যের একটিও উপস্থিত থাকে তবে তাকে বস্তিবাসা (স্লাম হাউসহোল্ড) বলে চিহ্নিত করতে হবে, যথা—ক. খারাপ বাসস্থান, খ. ঘনবসতি ও ঘিঞ্জি আবাস, গ. নিরাপদ পানীয় জলের অপ্রতুলতা, ঘ. অপর্যাপ্ত শৌচালয়, এবং ঙ. স্বত্বহীন আবাস। অতএব বস্তি কাকে বলব তা ঠিক হবে তার বাসাগুলির অবস্থা এবং পরিকাঠামো ও পরিষেবার মান বিচার করে; যা প্রধানত বাসস্থানের অবস্থা, পানীয় জল, শৌচালয় ও পয়োপ্রণালীর লভ্যতার ওপর নির্ভরশীল। বাস্তবিক নাগরিকদের স্বাস্থ্য অনেকটাই নির্ভর করে এইসব পরিকাঠামো ও পরিষেবাগুলির অস্তিত্বের ওপর। ভারতবর্ষের

ভারতবর্ষের ২০০১-এর সেনসাস বা আদমশুমারি থেকে প্রথম সার্বিকভাবে বস্তি গণনার কাজ শুরু হয়।

২০০১-এর সেনসাস বা আদমশুমারি থেকে প্রথম সার্বিকভাবে বস্তি গণনার কাজ শুরু হয়। এই জনগণনায় ভারতবর্ষের বস্তিবাসীর সংখ্যা ৫.২৪ কোটি (মোট শহরবাসীদের ১৮.৩%)। ২০০১-এর সেনসাস সংজ্ঞা অনুযায়ী আইনানুগভাবে বিজ্ঞাপিত অথবা রাজ্য বা স্থানীয় প্রশাসন স্বীকৃত বস্তি ছাড়াও কোনো একটি এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যথাযথ শৌচাগার, পয়োপ্রণালী ও পানীয় জল ছাড়া অপর্যাপ্ত পরিকাঠামোয় খারাপভাবে তৈরি ন্যূনতম ৬০-৭০টি বাসা (হাউসহোল্ড) থাকলে অথবা অন্তত ৩০০ মানুষ ঘিঞ্জিভাবে বসবাস করলে তাকে বস্তি বলা হবে। ইতিমধ্যে নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে ইউনাইটেড নেশন্‌স (ইউ.এন) অতি দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির অভাবগ্রস্ত মানুষদের জীবনের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিকভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্‌স বা এম.ডি.জি) স্থির করলে বস্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা পরিবর্তনের কিছু প্রচেষ্টা দেখা যায়। ইউ.এন-এর কার্যকরী সংজ্ঞায় যার প্রতিফলন রয়েছে। ভারতসহ ইউ.এন-এর ১৯২টি সদস্য রাষ্ট্র ও ২৩টি আন্তর্জাতিক সংগঠন এই এম.ডি.জি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে। এম.ডি.জি-র ৭ নং লক্ষ্য 'সুস্থায়ী পরিবেশ সুনিশ্চিতকরণ'-এর অন্তর্ভুক্ত অভীষ্টে (টার্গেট) বলা হয়েছে প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা ও কার্যক্রমগুলির মধ্যে সুস্থায়ী উন্নয়নের নীতিগুলিকে অঙ্গীভূত করতে হবে ও পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে হবে। অন্যান্য অভীষ্টে বলা হয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে অন্তত অর্ধেক শহরবাসীকে উন্নত পয়োপ্রণালী ও নিরাপদ পানীয় জল দিতে হবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে হবে। যদিও ওই সময়ে সারা বিশ্বে

বস্তিবাসীর আনুমানিক সংখ্যা হবে প্রায় ১৪০ কোটি। ইউ.এন-এর তথ্যানুযায়ী ২০১৩-২০১৪-তে উন্নয়নশীল বিশ্বে বস্তিবাসীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে হয়েছে ৮৬ কোটির কিছু বেশি, যা আনুপাতিক হিসেবে মোট শহরবাসীদের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এবং সারা বিশ্বের বস্তিবাসীদের প্রায় ৯০%। এম.ডি.জি ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভারতবর্ষে বস্তিবাসীদের উন্নতিকল্পে সঠিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দশ্যে ২০১১ সেনসাস-এর বিচার্য বিষয়গুলি স্থির করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এজন্য ২০০৮ সালে প্ল্যানিং কমিশনের তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা ড. প্রণব সেন-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ শুরু করে। এই কমিটি তার রিপোর্টে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন বা এন.এস.এস.ও) নির্ধারিত বস্তির সংজ্ঞাটি গ্রহণ করে অর্থাৎ অন্য সব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি সাপেক্ষে একত্রে ২০-২৫টি বস্তিবাসার সমাহারকেই বিবেচনা করে। কমিটি বস্তির সংখ্যা নিরূপণ করতে গিয়ে তার বিধিসম্মত স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি গ্রাহ্য করেনি কারণ কমিটির মতে এই স্বীকৃতি বিচারে বস্তিবাসীদের জীবনযাপনের অবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রণব সেন কমিটির হিসেব অনুযায়ী ২০১১-য় দেশে বস্তিবাসীর আনুমানিক সংখ্যা হওয়ার কথা ৯.৩ কোটি। যদিও সেনসাসের হিসেবে এই সংখ্যা ২০১১-য় ৬.৫৪ কোটি (মোট শহরবাসীদের ১৭.৪)। ২০১১-র সেনসাস-এর সংজ্ঞায় অবশ্য বস্তিকে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত (নোটিফায়েড) বা অঘোষিত কিন্তু স্বীকৃত (রেকগনাইজড) এবং কেবল সেনসাস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত (আইডেন্টিফায়েড), এই তিনভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। চিহ্নিত বস্তিগুলির ক্ষেত্রে ২০০১-এর আদমশুমারির মতোই অন্তত ন্যূনতম ৬০-৭০টি বস্তিবাসা বা ৩০০ মানুষের বসবাসকেই বিচারের মানদণ্ড ধরা হয়। পরিকল্পনাবিদদের মতে সেনসাস শুমারিতে ছোটো শহরের বস্তি ও বড়ো শহরের ছোটো বস্তিগুলি বাদ যাওয়াই প্রণব সেন কমিটি ও সেনসাসের গণনায় পার্থক্যের মূল কারণ। তাই বস্তিবাসীদের সংখ্যা বাড়লেও শহরবাসীদের মধ্যে তাদের অনুপাত ক্রমশ কমতে দেখা যায়। তাছাড়া গ্রাম থেকে আসা বা উচ্ছেদ হওয়া, ফুটপাথ, খালপাড়, রেললাইন, সরকারি ন্যস্ত জমি ইত্যাদিতে বসবাসকারী ঝুপড়িবাসীদের আস্তানাগুলি অধিকাংস ক্ষেত্রে অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমান হওয়ায় তাঁরাও হিসেবের বাইরে থেকে যান এবং সবরকম জরুরি নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে চূড়ান্ত এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হন। অথচ এন.এস.এস.ও ২০০৮-২০০৯ অনুযায়ী ভারতের মোট ৪৯ হাজার বস্তির ৩৬% রয়েছে নালা, নর্দমা ও রেললাইনের ধারে এবং ৫৭% রয়েছে সরকারি জমিতে। গবেষক গৌতম ভান ও অরিন্দম জানা-র মতে (২০১৩, *ই.পি.ডব্লিউ*) ক্রমাগত উচ্ছেদ হওয়া নগর-প্রান্তিক এইসব মানুষদের আস্তানাগুলি বস্তিবাসারূপে গণ্য না হওয়ায় সেনসাসের গণনা স্বাভাবিকভাবেই কম (আন্ডারকাউন্টিং) হয়ে যায়। আর এর প্রতিফলস্বরূপ বস্তিবাসীরা নগরায়ণের মূল স্রোত থেকে সামাজিকভাবে বর্জিত থেকে যান।

বস্তি নির্ধারণে বাসস্থান ও পরিকাঠামো প্রধান বিচার্য হলেও এগুলি মূলত বস্তির বৈশিষ্ট্যের বহিরঙ্গ। বস্তিজীবনের অন্তস্থলে রয়েছে স্বনির্ভরতা, স্বউদ্যোগ, কর্মতৎপরতা, স্বতঃস্ফূর্ত সশ্রম নির্মাণ, গোষ্ঠীবদ্ধতা ও যৌথ কর্মপ্রয়াসের সংস্কৃতি ইত্যাদি ইতিবাচক দিক। আর সেই সঙ্গে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বিভিন্ন জরুরি পরিষেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ/শ্রমসময় ব্যয়, স্বাস্থ্যহীনতা ও স্বাস্থ্যবিধির অজ্ঞতা, অপুষ্টি, অশিক্ষা, মহিলা ও শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অভাব আইনি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বিভিন্ন অবৈধ ক্ষমতা ও সমাজবিরোধী শক্তির প্রভাব ইত্যাদি নেতিবাচক দিক। বস্তি নির্ধারণে অন্তঃস্থিত চরিত্রগত এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচ্য না হলেও বস্তিবাসীদের জীবনের মান উন্নয়নে এগুলির গুরুত্ব অসীম। কারণ বস্তির সার্বিক পরিবেশের সঙ্গে এগুলি সদা সম্পৃক্ত। বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্য, আয়ু ও কর্মদক্ষতাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে বস্তির এই সার্বিক পরিবেশ। তাই পরে দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতাকেও বস্তির বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

(পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়)।

লেখক সমাজ গবেষক, একটি নগরোন্নয়ন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাবিদ্।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজস্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজস্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়া হাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

ফোন-৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬